উপেন্দ্রকিশোরের ছোটদের সেরা গল্প

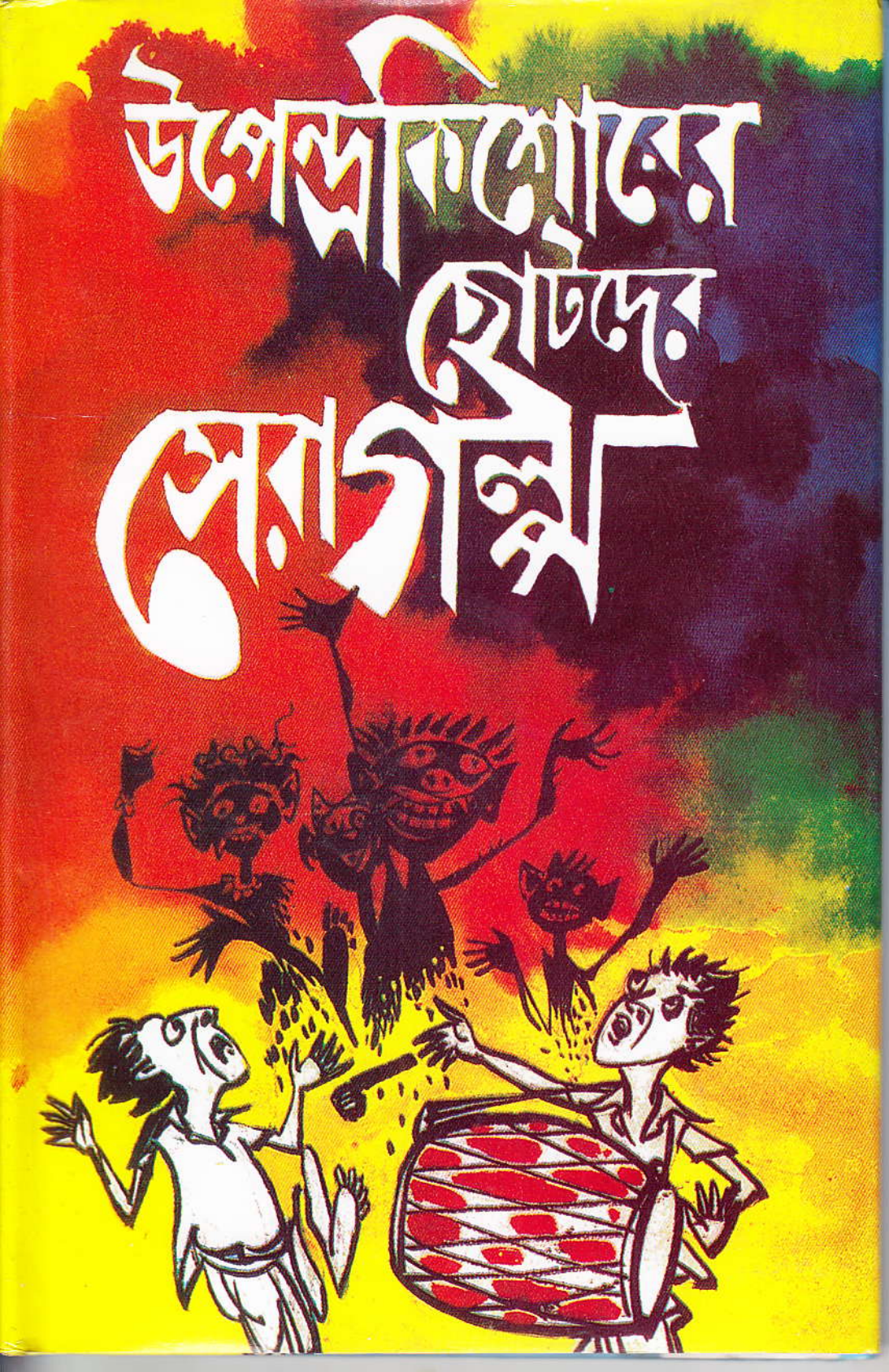

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

আলোকিত মানুষ চাই

উপেন্দ্রকিশোরের ছোটদের সেরা গল্প

সম্পাদনা

আহমাদ মাযহার

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৩৬

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
পৌষ ১৪০১ জানুয়ারি ১৯৯৫

ষষ্ঠ সংস্করণ দশম মুদ্রণ
অগ্রহায়ণ ১৪২৩ ডিসেম্বর ২০১৬

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৭ ময়মনসিংহ রোড, বাংলামটর, ঢাকা ১০০০
ফোন : ৯৬৬০৮১২ ৫৮৬১২৩৭৪ ০১৮৩৯৯০৬৭৫৪

মুদ্রণ
ওমাসিস প্রিন্টার্স
২৭৮/৩ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
হাশেম খান

অলঙ্করণ
সৈয়দ এনায়েত হোসেন

মূল্য
একশত টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0035-7

UPENDRAKISHORER CHHOTODER SHERA GALPO
Best children's stories of Upendrakishore Ray Chowdhury
Introduction by Ahmad Mazhar
Published by Bishwo Shahitto Kendro
17 Mymensing Road, Banglamotor, Dhaka 1000 Bangladesh

Email : bskprokashona@gmail.com www.bsksale.com

Price : Tk. 100.00 only

ভূমিকা

বাঙালি জাতির আধুনিককালের শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাসে ঠাকুর পরিবারের পরেই যে পরিবারটি সবচেয়ে স্মরণীয় তা হচ্ছে উপেন্দ্রকিশোর-সুকুমার-সাহিত্যের জন্মদাতা রায়চৌধুরী পরিবার। এ পরিবারের প্রথম কৃতীপুরুষ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বাঙালির আধুনিককালের গোড়ার দিককার ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় পুরুষ— যিনি শুধু শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রেই নন— চিত্রকলা, মুদ্রণশিল্প এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেরও এক অবিস্মরণীয় প্রতিভা।

উনিশ শতকে বাঙালি জাতির মধ্যে যে ব্যাপক জাগরণ ঘটেছিল উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ছিলেন সেই জাগরণের অন্যতম প্রতিভূ। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ ও বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে পরিবর্ধমান বাংলাসাহিত্য উপেন্দ্রকিশোরের করস্পর্শে অপেক্ষাকৃত ভিন্নভাবে উপকৃত ও উন্নত হল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদের পর বঙ্কিমচন্দ্রের মাধ্যমে যেমন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আলোময় অগ্রযাত্রার সূচনা, তেমনিভাবে বিদ্যাসাগরের পর উপেন্দ্রকিশোর (জন্ম ১০ মে ১৮৩৩)-এর মাধ্যমে বাংলা শিশুসাহিত্যের অগ্রযাত্রা সূচিত হয়েছিল আধুনিকতার মণিময় পথে।

এমন একটা সময়ে উপেন্দ্রকিশোর ছোটদের জন্য লিখতে শুরু করলেন যখন বাংলা ভাষায় শিশুপোযোগী রচনা শুধু অপরিণতই ছিল না, ছিল বিরলও। শিশুপাঠ্য রচনার যে দু-একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যেত সেগুলোও প্রধানত ছিল বিদেশি রচনার অনুকৃতি বা অনুবাদ। বিদ্যাসাগরের রচনার বাইরে বাংলার বা বাঙালির নিজস্বতা নিয়ে লিখিত শিশুপাঠ্য রচনার পরিমাণ তখনও বেশ কম।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তীকালের লেখক হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোরের সাহিত্যযাত্রার যে মিল খুঁজে পাওয়া যায় তা যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক। লিখতে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র অনুভব করেছিলেন বাংলা ভাষায় উন্নত সাহিত্যপত্রিকার অভাব; সেই অভাব মোচনের জন্যেই তিনি প্রকাশ করেছিলেন 'বঙ্গদর্শন'; একইভাবে ছোটদের জন্য লিখতে গিয়ে উপেন্দ্রকিশোরও অনুভব করেছিলেন ছোটদের উপযোগী লেখা প্রকাশের ও ছোটদের আকর্ষণ করতে এবং তাদের মনের জগৎকে স্পর্শ করতে পারে এমন পত্রিকার অভাব। একই সঙ্গে প্রকট অভাব ছোটদের মনের

মতো ছাপা বইয়েরও। এই অভাববোধ তাড়িত হয়ে তিনি প্রকাশ করেছিলেন ছোটদের পত্রিকা 'সন্দেশ'।

নিজ সম্পাদনায় 'সন্দেশ' পত্রিকা প্রকাশিত হবার আগেই উপেন্দ্রকিশোর ছোটদের জন্য লিখতে শুরু করেছিলেন। ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পাশ করার পর যখন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি পড়তে যান তখন থেকেই তাঁর সৃষ্টি যাত্রার সূচনা। সে-সময় 'সখা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হত। ১৮৮৩ সালে এই পত্রিকার মাধ্যমেই উপেন্দ্রকিশোর ছোটদের জন্য লিখতে শুরু করলেন। এটা সেই সময় যখন ইংরেজ শাসকদের উদ্যোগে বাঙালিদের মধ্যে শিক্ষার স্ফুরণ ঘটতে শুরু করেছে কিছুটা ব্যাপকভাবে এবং শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মধ্যে গড়ে উঠছে স্বজাত্যবোধ। তিনি অনুভব করলেন জাতির উন্নতি ঘটাতে হলে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে হবে শিশুদের।

রামায়ণ, মহাভারত ভারতীয় সংস্কৃতির মূল উৎস। তিনি উপলব্ধি করলেন স্বজাতির সংস্কৃতিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরতে হবে শিশুদের সামনে। এই প্রেরণা থেকেই তিনি রামায়ণের ঘটনাবলি ছোটদের উপযোগী ভাষায় লিখে ফেলেন। 'ছেলেদের রামায়ণ' প্রকাশিত হবার পর তিনি লেখেন 'ছেলেদের মহাভারত', 'মহাভারতের কথা' ও 'পৌরাণিক কাহিনী'।

পৌরাণিক উপাখ্যানগুলো ছোটদের উপযোগী করে লিখতে গিয়ে উপেন্দ্রকিশোর যে শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন তা বিস্ময়কর। পৌরাণিক কাহিনীর শৈথিল্যকে বর্জন করেও বিশালত্বের অনুভূতিকে বজায় রাখতে পারা খুব সহজ ব্যাপার নয়। 'ছেলেদের রামায়ণ', 'ছেলেদের মহাভারত', 'মহাভারতের কথা' বইগুলোতে উপেন্দ্রকিশোর পৌরাণিক কাহিনীর শিশুকিশোরোপযোগী আধুনিক রূপায়ণে সফল হয়েছেন। বলা চলে তাঁর এই রূপায়ণের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে বাংলাসাহিত্যে রামায়ণ মহাভারত কাহিনীর আধুনিক রূপায়ণগুলো অনুপ্রেরিত হয়েছে।

তাঁর সৃজনপ্রতিভা আরো একটি উল্লেখযোগ্য দিকে প্রবাহিত হয়েছিল যা বিশেষভাবে গুরুত্ববহ। বর্তমান গ্রন্থটি উপেন্দ্রকিশোরের প্রতিভার সেই আলোকময় দিকেরই প্রতিনিধি।

তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বাংলার ঘরে ঘরে মেয়েদের মুখে যুগ যুগ ধরে তৈরি হয়েছে যে কাহিনী—সেইসব কাহিনীতে রয়েছে কল্পনা-প্রতিভা, স্নিগ্ধতা ও সরলতার বিপুল সম্ভার; এবং তা বাঙালির প্রাণের একান্ত গভীর তল থেকে উত্থিত। এই সম্পদকে চিরকালের সম্পদে পরিণত করার জন্যই তিনি লিখেছিলেন 'টুনটুনির বই'। 'টুনটুনির বই' ছাড়াও নিরবচ্ছিন্নভাবে তিনি বাংলার লোকায়ত জীবন থেকে উপকরণ ছেঁকে তুলে লিখে গেছেন প্রচুর সংখ্যক গল্পকথা। এইসব গল্পকথার বর্ণনা ও ঘটনাবৈচিত্র্য চিরকালের বাঙালি পাঠককে আকর্ষণ করে চলেছে তাঁর অনবদ্য প্রাণস্পর্শী গদ্যশৈলীর কারণে। বলা যায় বাংলা শিশুসাহিত্যের ভাষা প্রাথমিকভাবে গড়ে উঠেছে

উপেন্দ্রকিশোরের হাতেই; এ ভাষা আজও যেমন আধুনিক তেমনি সহজ। উপেন্দ্রকিশোরের শিশুসাহিত্যের প্রধানতম বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই সহজবোধ্যতা।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সম্পাদিত 'সন্দেশ'–এর প্রকাশ বাংলা শিশুসাহিত্যের ইতিহাসে সবচেয়ে স্মরণযোগ্য ঘটনা। রায়চৌধুরী পরিবারের চার পুরুষ ধরে এই পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা শিশুসাহিত্যকে শুধু সমৃদ্ধ করেনি— এই সন্দেশ পত্রিকা এক শতাব্দীকাল ধরে বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক উল্লেখযোগ্য রচনা উপহার দিয়েছে। 'সন্দেশ' পত্রিকাই প্রথম আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল বাংলা শিশুসাহিত্যের বিচিত্রময়তাকে। একসময় সর্বাধুনিক ও উন্নত মুদ্রণসৌকর্যের নিদর্শনও ছিল এই 'সন্দেশ' পত্রিকা। একসময় শিশুসাহিত্যের গ্রন্থসমূহের অঙ্গসজ্জা কী ধরনের হবে তার উচ্চতম দৃষ্টান্তও ছিল 'সন্দেশ'।

মুদ্রণশিল্পের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে নতুন যুগের সূচনাও হয়েছিল উপেন্দ্রকিশোরের হাতেই। বিশেষ করে সুন্দর ও নিখুঁত ছবি মুদ্রণের দিকে তিনি গভীর মনোযোগ দিয়েছিলেন। হাফটোন ব্লকের উন্নতিতে তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিশেষ ফলপ্রদ ভূমিকা পালন করেছিল। তৎকালে বিলেতের বিখ্যাত পত্রিকা পেনরোজ অ্যানুয়েল–এ উপেন্দ্রকিশোর নিজের গবেষণালব্ধ ফলাফল লিখে পাঠাতেন। তাঁর উদ্ভাবিত হাফটোন ব্লক তৈরির নতুন নিয়ম ইউরোপীয়রাও গ্রহণ করেছিল। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুকুমার রায় ১৯১১ সালে ফটোগ্রাফি ও ছবি ছাপা সম্বন্ধে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করতে প্রবর্তিত রীতির প্রয়োগও দেখে এসেছিলেন। সাম্প্রতিককালে বিশাল মণ্ডলে পরিণত হওয়া বাংলা শিশুসাহিত্যের ভুবনে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী শুধু একজন পথিকৃৎ হিশেবেই স্মরণীয় নন, তিনি সর্বকালের বাঙালির কাছে বরণযোগ্য একজন শিশুসাহিত্যিক।

আহমাদ মাযহার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা ১০০০

ফেব্রুয়ারি ১৯৯০

সূচি

গুপি গাইন ও বাঘা বাইন ১১

২৬ টুনটুনি আর রাজার কথা
৩০ বোকা কুমিরের কথা
৩১ শিয়াল পণ্ডিত
৩৪ দুষ্ট বাঘ
৩৮ বাঘের উপর টাগ
৪২ টুনটুনি আর নাপিতের কথা

নরহরি দাস ৪৬
জোলা আর সাত ভূত ৪৯
দুঃখীরাম ৫৫
ছোট ভাই ৬৬
সাতমার পালোয়ান ৬৯
তিনটি বর ৭৪

গুপি গাইন ও বাঘা বাইন

তোমরা গান গাইতে পার? আমি একজন লোকের কথা বলব, সে একটা গান গাইতে পারত। তার নাম ছিল গুপি কাইন, তার বাবার নাম ছিল কানু কাইন। তার একটা মুদির দোকান ছিল। গুপি কিনা একটা গান গাইতে পারত, আর সে গ্রামের আর কেউ কিছু গাইতে পারত না, তাই তারা তাকে খাতির করে বলত 'গুপি গাইন'।

গুপি যদিও একটা বৈ গান জানত না, কিন্তু সেই একটা গান সে খুব করেই গাইত; সেটা না-গেয়ে সে তিলেকও থাকতে পারত না, তার দম আটকে আসত। যখন সে ঘরে বসে গান গাইত, তখন তার বাবার দোকানের খদ্দের সব ছুটে পালাত। যখন সে মাঠে গিয়ে গান গাইত, তখন মাঠের যত গরু সব দড়ি ছিঁড়ে ভাগত। শেষে আর তার ভয়ে তার বাবার দোকানে খদ্দেরই আসে না, রাখালেরাও মাঠে গরু নিয়ে যেতে পারে না। তখন একদিন কানু কাইন তাকে এক বড় বাঁশ নিয়ে তাড়া করতে সে ছুটে মাঠে চলে গেল; সেখানে রাখালের দল লাঠি নিয়ে আসতে বনের ভিতর গিয়ে খুব করে গলা ভাঁজতে লাগল।

গুপিদের গ্রামের কাছেই আরেকটা গ্রামে একজন লোক থাকত, তার নাম ছিল পাঁচু পাইন। পাঁচুর ছেলেটির বড্ড ঢোলক বাজাবার শখ ছিল। বাজাতে বাজাতে সে বিষম ঢুলতে থাকত, আর পা নাড়ত আর চোখ পাকাত, আর দাঁত খিঁচোত, আর ভ্রূকুটি করত। তার গ্রামের লোকেরা তা দেখে হাঁ করে থাকত আর বলত, 'আহা! আ-া-া!! অ-অ-অ-হ-হ-হ!!!' শেষে যখন 'হাঃ, হাঃ, হা-হা!' বলে বাঘের মতো খেঁকিয়ে উঠত, তখন সকলে পালাবার ফাঁক না পেয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে যেত। তাই থেকে সকলে তাকে বলত 'বাঘা বাইন।' তার এই বাঘা নামই রটে গিয়েছিল; আসল নাম যে তার কী, তা কেউ জানত না।

বাঘা ঢোলক বাজাত আর রোজ একটা করে ঢোলক ভাঙত। শেষে আর পাঁচু তার ঢোলকের পয়সা দিয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু বাঘার বাজনা বন্ধ হবে, তা-ও কি হয়? গ্রামের লোকেরা পাঁচুকে বলল, 'তুমি না পার, না হয় আমরাই সকলে চাঁদা করে ঢোলকের পয়সাটা দি। আমাদের গ্রামে এমন একটা ওস্তাদ হয়েছে, তার বাজনাটা বন্ধ হয়ে যাবে!' শেষে ঠিক হল যে গ্রামের সকলে চাঁদা করে বাঘাকে একটা ঢোলক কিনে

দেবে, আর সেই ঢোলকটি আর তার ছাউনি খুব মজবুত হবে, যাতে বাঘার হাতেও সেটা আর সহজে না ছেঁড়ে।

সে যা ঢোলক হল! তার মুখ হল সাড়ে-তিন হাত চওড়া, আর ছাউনি মোষের চামড়ার। বাঘা সেটা পেয়ে যারপরনাই খুশি হয়ে বললে, 'আমি দাঁড়িয়ে বাজাব।'

তখন থেকে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই ঢোলক লাঠি দিয়ে বাজায়। দেড় মাস দিনরাত বাজিয়েও বাঘা সেটাকে ছিঁড়তে পারল না। ততদিনে তার বাজনা শুনে শুনে তার বাপ-মা পাগল হয়ে গেল, গ্রামের লোকের মাথা ঘুরতে লাগল। আর দিনকতক এইভাবে চললে কী হত বলা যায় না। এর মধ্যে একদিন গ্রামের সকলে মিলে মোটা মোটা লাঠি নিয়ে এসে বাঘাকে বললে, 'লক্ষ্মী, দাদা! তোমাকে দশ হাঁড়ি মিঠাই দিচ্ছি, অন্য কোথাও চলে যাও, নইলে আমরা সবাই পাগল হয়ে যাব!'

বাঘা আর কী করে? তখন কাজেই তাকে অন্য একটা গ্রামে যেতে হল। সেখানে দুদিন না থাকতে থাকতেই সেখানকার সকলে মিলে তাকে গ্রাম থেকে বার করে দিল। তারপর থেকে সে যেখানেই যায়, সেখান থেকেই তাকে তাড়িয়ে দেয়। তখন সে করল কি, সারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায়, ক্ষুধার সময় তার নিজের গ্রামে গিয়ে ঢোলক বাজাতে থাকে, আর গ্রামের লোক তাড়াতাড়ি তাকে কিছু খাবার দিয়ে বিদায় করে বলে, 'বাঁচলাম!' তারপর এমন হল যে আর কেউ তাকে খেতে দেয় না। আর তার ঢোলকের আওয়াজ শুনলেই আশপাশের সকল গ্রামের লোক লাঠি নিয়ে আসে। তখন বেচারা ভাবল, 'আর না! মূর্খদের কাছে থাকার চেয়ে বনে চলে যাওয়াই ভালো। না-হয় বাঘে খাবে, তবুও আমার বাজনা চলবে!' এই বলে বাঘা তার ঢোলকটিকে ঘাড়ে করে বনে চলে গেল।

এখন বাঘার বেশ মজাই হয়েছে। এখন আর কেউ তার বাজনা শুনে লাঠি নিয়ে আসে না। বাঘে খাবে দূরে থাক, সে বনে বাঘ-ভালুক কিছু নেই। আছে খালি একটা ভয়ানক জানোয়ার ; বাঘা আজও তাকে দেখতে পায় নি, শুধু দূর থেকে তার ডাক শুনে ভয়ে থরথরিয়ে কাঁপে, আর ভাবে, 'বাবা গো। ওটা এলেই তো ঢোলকসুদ্ধ আমাকে গিলে খাবে!'

সে ভয়ানক জানোয়ার কিন্তু কেউ নয়, সে গুপি গাইন। বাঘা যে ডাক শুনে কাঁপে, সে গুপির গলা ভাঁজা। গুপিও বাঘার বাজনা শুনতে পায়, আর বাঘারই মতো ভয়ে কাঁপে। শেষে একটু ভাবল, 'এ বনে থাকলে কখন প্রাণটা যাবে, তার চেয়ে এই বেলা এখান থেকে পালাই।' এই ভেবে গুপি চুপিচুপি বন থেকে বেরিয়ে পড়ল। বেরিয়েই দেখে আর-একটি লোকও এক বিশাল ঢোল মাথায় করে সেই বনের ভিতর থেকে আসছে। তাকে দেখেই ভারি আশ্চর্য হয়ে গুপি জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কে হে?'

বাঘা বললে, 'আমি বাঘা বাইন ; তুমি কে?'

গুপি বললে, 'আমি গুপি গাইন ; তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

বাঘা বললে, 'যেখানে জায়গা জোটে, সেইখানেই যাচ্ছি। গ্রামের লোকগুলো গাধা, গানবাজনা বোঝে না, তাই ঢোলটি নিয়ে বনে চলে এসেছিলাম। তা ভাই, এখানে যে

ভয়ংকর জানোয়ারের ডাক শুনেছি, তার সামনে পড়লে আর প্রাণটি থাকবে না। তাই পালিয়ে যাচ্ছি।'

গুপি বললে, 'তাই তো! আমিও যে একটা জানোয়ারের ডাক শুনেই পালিয়ে যাচ্ছিলাম। বলো তো তুমি জানোয়ারটাকে কোথায় বসে ডাকতে শুনেছিলে?'

বাঘা বললে, 'বনের পূর্বধারে, বটগাছের তলায়।'

গুপি বললে, 'আচ্ছা, সে যে আমারই গান শুনেছ! সে কেন জানোয়ারের ডাক হবে? সেই জানোয়ারটা ডাকে বনের পশ্চিম ধারে, হরতুকীতলায় বসে।'

বাঘা বললে, 'সে তো আমার ঢোলকের আওয়াজ, আমি যে ওইখানে থাকতাম।' এতক্ষণে তারা বুঝতে পারল যে, তারা তাদের নিজেদের গান আর বাজনা শুনেই ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। তখন যে দুজনার হাসি! অনেক হেসে তারপর গুপি বললে, 'ভাই, আমি যেমন গাইন, তুমি তেমন বাইন! আমরা দুজনে জুটলে নিশ্চয় একটা কিছু করতে পারি।'

এ কথায় বাঘারও খুবই মত হল। কাজেই তারা খানিক কথাবার্তার পর ঠিক করল যে, তারা দুজনায় মিলে রাজামশাইকে গান শোনাতে যাবে, রাজামশাই যে তাতে খুব খুশি হবেন, তাতে তো আর ভুলই নেই, চাই কি অর্ধেক রাজ্য বা মেয়ের সঙ্গে বিয়েও দিয়ে ফেলতে পারেন।

গুপির আর বাঘার মনে এখন খুবই আনন্দ, তারা রাজাকে গান শুনাতে যাবে। দুজনে হাসতে হাসতে আর নাচতে নাচতে এক প্রকাণ্ড নদীর ধারে এসে উপস্থিত হল; সেই নদী পার হয়ে রাজবাড়ি যেতে হয়।

নদীতে খেয়া আছে, কিন্তু নেয়ে পয়সা চায়। বেচারারা বন থেকে এসেছে, পয়সা কোথায় পাবে! তারা বলল, 'ভাই, আমাদের কাছে তো পয়সা-টয়সা নেই, আমরা না-হয় তোমাদের গেয়ে-বাজিয়ে শোনাব, আমাদের পার করে দাও।' তাতে খেয়ার চড়নদারেরা খুব খুশি হয়ে নেয়েকে বলল, 'আমরা চাঁদা করে এদের পয়সা দেব, তুমি এদের তুলে নাও।'

বাঘার ঢোলটি দেখেই নেয়েরও বাজনা শুনতে ভারি সাধ হয়েছিল, কাজেই সে এই কথায় আর কোনো আপত্তি করল না। গুপিকে আর বাঘাকে তুলে নিয়ে নৌকো ছেড়ে দেওয়া হল। নৌকো-ভরা লোক, বসে বাজাবার জায়গা কোথায় হবে? অনেক কষ্টে সকলের মাঝখানে খানিকটা জায়গা হতে হতে নৌকোও নদীর মাঝখানে এসে পড়ল। তারপর খানিক একটু গুনগুনিয়ে গুপি গান ধরল, বাঘা তার ঢোলকে লাঠি লাগাল, আর অমনি নৌকোসুদ্ধ সকল লোক বিষম চমকে গিয়ে গড়াগড়ি আর জড়াজড়ি করে দিল নৌকোখানাকে উল্‌টে।

তখন তো আর বিপদের অন্তই নেই। ভাগ্যিস বাঘার ঢোলকটি এতবড় ছিল তাই আঁকড়ে ধরে দুজনার প্রাণরক্ষা হল। কিন্তু তাদের আর রাজবাড়ি যাওয়া ঘটল না। তারা সারাদিন সেই নদীর স্রোতে ভেসে শেষে সন্ধ্যাবেলায় এক ভীষণ বনের ভিতরে গিয়ে কূলে ঠেকল। সে বনে দিনের বেলায় গেলেই ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়, রাত্রিরে তো আর

কথাই নেই। তখন বাঘা বলল, 'গুপিদা, বড়ই তো বিষম দেখছি! এখন কী করি বল তো।' গুপি বলল, 'করব আর কী? আমি গাইব, তুমি বাজাবে। নিতান্তই যখন বাঘে খাবে, তখন আমাদের বিদ্যেটা তাকে না দেখিয়ে ছাড়ি কেন?'

বাঘা বলল, 'ঠিক বলেছ দাদা। মরতে হয় তো ওস্তাদলোকের মতোন মরি, পাড়াগেঁয়ে ভূতের মতো মরতে রাজি নই!'

এই বলে দুজনায় সেই ভিজা কাপড়েই প্রাণ খুলে গানবাজনা শুরু করল। বাঘার ঢোলটি সেদিন কিনা ভিজা ছিল, তাইতে তার আওয়াজটি হয়েছিল যারপরনাই গম্ভীর। আর গুপিও ভাবছিল, এই তার শেষ গান, কাজেই তার গলার আওয়াজটিও খুবই গম্ভীর হয়েছিল। সে গান যে কী জমাট হয়েছিল, সে আর কী বলব? এক ঘণ্টা দুঘণ্টা করে দুপুররাত হয়ে গেল, তবু তাদের সে গান থামছেই না।

এমন সময় তাদের দুজনারই মনে হল, যেন চারিদিকে একটা কী কাণ্ড হচ্ছে। ঝাপসা ঝাপসা কালো কালো, এই বড় বড় কী যেন সব গাছের উপর থেকে উঁকি মারতে লেগেছে; তাদের চোখগুলো জ্বলছে, যেন আগুনের ভাঁটা, দাঁতগুলো বেরুচ্ছে যেন মুলোর সার। তা দেখে তখনই আপনা হতে বাঘার বাজনা থেমে গেল, তার সঙ্গে দুজনার হাত-পা গুটিয়ে, পিঠ বেঁকে, ঘাড় বসে, চোখ বেরিয়ে মুখ হাঁ করে এল। তাদের গায়ে এমনি কাঁপুনি আর দাঁতে এমনি ঠকঠকি ধরে গেল যে আর তাদের ছুটে পালাবারও জো রইল না।

ভূতগুলি কিন্তু তাদের কিছু করল না। তারা তাদের গানবাজনা শুনে ভারি খুশি হয়ে এসেছে—তাদের রাজার ছেলের বিয়েতে গুপির আর বাঘার বায়না করতে। গান থামতে দেখে তারা নাকিসুরে বলল, 'থামলি কেন বাপ? বাজা, বাজা, বাজা!'

এ কথায় গুপির আর বাঘার একটু সাহস হল; তারা ভাবল, 'এ তো মন্দ মজা নয়, তবে একটু গেয়েই দেখি না।' এই বলে যেই তারা আবার গান ধরেছে, অমনি ভূতেরা একজন দুজন করে গাছ থেকে নেমে এসে তাদের ঘিরে নাচতে লাগল।

সে যে কী কাণ্ডকারখানা হয়েছিল, সে কি না-দেখলে বোঝবার জো আছে! গুপি আর বাঘা তাদের জীবনে আর কখনো এমন সমঝদারের দেখা পায় নি। সে রাত এমনিভাবেই কেটে গেল। ভোর হলে তো আর ভূতেদের বাইরে থাকবার জো নেই, কাজেই তার একটু আগেই তারা বলল, 'চল্ বাবা মোদের গোদার বেটার বে'তে! তোদের খুশি করে দিব।'

গুপি বলল, 'আমরা যে রাজবাড়ি যাব!' ভূতেরা বলল, 'সে যাবি এখন, আগে মোদের বাড়ি একটু গানবাজনা শুনিয়ে যা! তোদের খুশি করে দিব!' কাজেই তখন তারা দুজনে ঢোল নিয়ে ভূতেদের বাড়ি চলল। সেখানে গানবাজনা যা হল, সে আর বলে কাজ নেই। তারপর তাদের বিদায় করবার সময় ভূতেরা বলল, 'তোরা কী চাস?'

গুপি বলল, 'আমরা এই চাই যে আমরা যেন গেয়ে বাজিয়ে সকলকে খুশি করতে পারি।' ভূতেরা বলল, 'তাই হবে, তোদের গানবাজনা শুনলে আর সে গান শেষ হওয়ার আগে কেউ সেখান থেকে উঠে যেতে পারবে না। আর কী চাস?'

গুপি বলল, 'আর এই চাই যে আমাদের যেন খাওয়া-পরার কষ্ট না হয়।' এ কথায় ভূতেরা তাদের একটি থলে দিয়ে বলল, 'তোরা যখন যা খেতে বা পরতে চাস, এই থলের ভিতরে হাত দিলেই তা পাবি। আর কী চাস?'

গুপি বলল, 'আর কী চাইব, তা তো বুঝতে পারছি না!' তখন ভূতেরা হাসতে হাসতে তাদের দুজনকে দুজোড়া জুতো এনে দিয়ে বলল, 'এই জুতো পায়ে দিয়ে তোরা যেখানে যেতে চাইবি, অমনি সেখানে গিয়ে হাজির হবি।'

তখন তো আর কোনো ভাবনাই রইল না। গুপি আর বাঘা ভূতদের কাছে বিদায় হয়ে, সেই জুতো পায়ে দিয়েই বলল, 'তবে আমরা এখন রাজবাড়ি যাব!' অমনি সেই ভীষণ বন কোথায় যেন মিলিয়ে গেল; গুপি আর বাঘা দেখল, তারা দুজনে একটা প্রকাণ্ড বাড়ির ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এতবড় আর এমন সুন্দর বাড়ি তারা জীবনে কখনো দেখেনি। তারা তখনই বুঝতে পারল যে, এ রাজবাড়ি।

কিন্তু এরমধ্যে ভারি একটা মুশকিল হল। রাজবাড়ির ফটকে যমদূতের মতো কতকগুলো দারোয়ান দাঁড়িয়ে ছিল, তারা গুপি আর বাঘাকে সেই ঢোল নিয়ে আসতে দেখেই দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'এইয়ো! কাঁহা যাতা হ্যায়?' গুপি থতমত খেয়ে বলল, 'বাবা, আমরা রাজামশাইকে গান শোনাতে এসেছি।' তাতে দারোয়ানগুলো আরো বিষম চটে গিয়ে লাঠি দেখিয়ে বলল, 'ভাগো, হিঁয়াসে।' গুপিও তখন নাক সিঁটকিয়ে বলল, 'ঈস্! আমরা তো রাজার কাছে যাবই।' বলতেই অমনি সেই জুতোর গুণে, তারা তৎক্ষণাৎ গিয়ে রাজামশায়ের সামনে উপস্থিত হল।

রাজবাড়ির অন্দরমহলে রাজামহাশয় ঘুমিয়ে আছেন, রানি তাঁর মাথার কাছে বসে তাঁকে হাওয়া করছেন, এমন সময় কথা নেই বার্তা নেই, গুপি আর বাঘা সেই সর্বনেশে ঢোল নিয়ে হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হল। জুতোর এমনি গুণ, দরজা-জানালা সব বন্ধ রয়েছে, তাতে তাদের একটুও আটকায়নি। কিন্তু আসবার বেলা আটকাক, আর নাই আটকাক, আসবার পরে খুবই আটকাল। রানি তাদের দেখে বিষম ভয় পেয়ে, এক চিৎকার দিয়ে তখনই অজ্ঞান হয়ে গেলেন; রাজামশাই লাফিয়ে উঠে পাগলের মতো ছুটাছুটি করতে লাগলেন; রাজবাড়িময় হুলস্থূল পড়ে গেল। সিপাই সান্ত্রী সব খাঁড়া ঢাল নিয়ে ছুটে এল। বেগতিক দেখে গুপি আর বাঘার মাথায় গোল লেগে গেল। তারা যদি তখন শুধু বলে, 'আমরা এখান থেকে অমুক জায়গায় চলে যাব,' তবেই তাদের জুতোর গুণে সকল ল্যাঠা চুকে যায়, কিন্তু সে কথা তাদের মনেই হল না। তারা গেল ছুটে পালাতে, আর দু-পা যেতে-না-যেতেই বেচারারা যে মারটা খেল! জুতো, লাঠি, চাবুক, কিল, চড়, কানমলা—কিছুই তাদের বাকি রইল না। শেষে রাজামশাই হুকুম দিলেন, 'বেটাদের নিয়ে তিন দিন হাজতে ফেলে রাখো। তারপর বিচার করে, হয় এদের মাথা কাটব, না-হয় কুত্তা দিয়ে খাওয়াব।' হায় গুপি! হায় বাঘা! বেচারারা এসেছিল রাজাকে গান শুনিয়ে কতই বকশিশ পাবে ভেবে, তার মধ্যে এ কী বিপদ! পেয়াদারা তাদের হাত বেঁধে মারতে মারতে একটা অন্ধকার ঘরে নিয়ে ফেলে রাখল। সেখানে পড়ে বেচারারা একদিন আর গায়ের ব্যথায় নড়তে চড়তে পারল না। তাতে তেমন দুঃখ ছিল না, কিন্তু

বাঘার ঢোলটি যে গেল, সেই হল সর্বনাশের কথা ! বাঘা বুক–মাথা চাপড়িয়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদছে, আর বলছে, 'ও গুপিদা।—ওঃ–ওঃ–হ–হ–হ–হ অ–অ ! আরে ও গুপিদা ! মার খেলাম, প্রাণ যাবে, তাতে দুঃখ নেই—কিন্তু দাদা, আমার ঢোলকটি যে গেল !'

গুপির কিন্তু ততক্ষণে মাথা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। সে বাঘার গায় মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'ভয় কী দাদা? ঢোল গিয়েছে, জুতো আর থলে তো আছে। আমরা নিতান্ত বেকুব, তাই এতগুলো মার খেলাম। যা হোক, যা হবার হয়ে গিয়েছে, এখন এর ভিতর থেকে একটু মজা করে নিতে হবে।' বাঘা এ কথায় একটু শান্ত হয়ে বলল, 'কী মজা করবে দাদা?' গুপি বলল, 'আগে তো খাবার মজাটা করে নিই, তারপর অন্য মজার কথা ভেবে দেখব এখন।'

এই বলে সে সেই ভূতের দেওয়া থলির ভিতরে হাত দিয়ে বলল, 'দাও তো দেখি, এক হাঁড়ি পোলাও।' অমনি একটা সুগন্ধ যে বেরুল ! তেমন পোলাও রাজারাও সচরাচর খেতে পান না। আর সে কী বিশাল হাঁড়ি ! গুপি কি সেটা থলির ভিতর থেকে তুলে আনতে পারে? যা হোক, কোনোমতে সেটাকে বার করে এনে তারপর থলিকে বলল, 'ভাজা, ব্যঞ্জন, চাটনি, মিঠাই, দই, রাবড়ি, শরবত।— শিগ্‌গির শিগ্‌গির দাও।' দেখতে দেখতে খাবার জিনিসে আর সোনা–রুপোর বাসনে ঘর ভরে গেল। দুজন লোকে আর কত খাবে? সে অপূর্ব খাবার খেয়ে তাদের গায়ের ব্যথা কোথায় চলে গেল তার আর ঠিক নেই।

তখন বাঘা বলল, 'দাদা, চল এই বেলা এখান থেকে পালাই, নইলে শেষে কুত্তা দিয়ে খাওয়াবে।' গুপি বলল, 'পাগল হয়েছ নাকি? আমাদের এমন জুতো থাকতেই কুত্তা দিয়ে খাওয়াবে? দেখাই যাক–না, কী হয়।' এ কথায় বাঘা খুব খুশি হল ; সে বুঝতে পারল যে, গুপিদা একটা–কিছু মজা করবে।

দুদিন চলে গেল, আর একদিন পরেই রাজা তাদের বিচার করবেন। বিচারের দিন রাত থাকতে উঠে গুপি থলের ভিতর হাত দিয়ে বলল, 'আমাদের দুজনের রাজপোশাক চাই।' বলতেই তার ভিতর থেকে এমন সুন্দর পোশাক বেরুল যে তেমন পোশাক কেউ তয়েরই করতে পারে না। সেই পোশাক তারা দুজনে পরে, তাদের পুরনো কাপড় আর বাসন ক'খানি পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে, জুতো পায়ে দিয়ে তারা বলল, 'এখন আমরা মাঠে হাওয়া খেতে যাব।' অমনি দেখে, রাজবাড়ির বাইরের প্রকাণ্ড মাঠে চলে এসেছে। সে মাঠের একজায়গায় তাদের পুঁটুলিটি লুকিয়ে রেখে, তারা বেড়াতে বেড়াতে এসে রাজবাড়ির সামনে উপস্থিত হল।

দূর থেকে আসতে দেখেই রাজার লোক ছুটে গিয়ে তাঁকে খবর দিয়েছিল যে, 'মহারাজ, দুজন রাজা আসছেন।' রাজাও তা শুনে তাঁর ফটকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাঘা আর গুপি আসতেই তিনি তাদের যারপরনাই আদর দেখিয়ে বাড়ির ভিতর নিয়ে গেলেন। চমৎকার একটি ঘরে তাদের বাসা দেওয়া হল। কত চাকর, বামুন, পেয়াদা, পাইক তাদের সেবাতে লেগে গেল, তার অন্ত নেই।

তারপর গুপি আর বাঘা হাত-পা ধুয়ে জলযোগ করে একটু ঠাণ্ডা হলেই রাজামশাই আবার তাদের খবর নিতে এলেন। তাদের পোশাক দেখে অবধিই তিনি ভেবে নিয়েছেন যে, 'না-জানি এঁরা কতবড় রাজাই হবেন।' তারপর শেষে যখন তিনি গুপিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কোন্ দেশের রাজা?' তখন গুপি হাতজোড় করে তাঁকে বলল, 'মহারাজ! আমরা কি রাজা হতে পারি? আমরা আপনার চাকর!'

গুপি সত্য কথাই বলেছিল, কিন্তু রাজার তাতে বিশ্বাস হল না। তিনি ভাবলেন, 'কি ভালো মানুষ, কেমন নরম হয়ে কথা বলে। যেমন বড় রাজা তেমনি ভদ্রলোকও দেখছি।' তিনি তখন আর বিশেষ কিছু না বলে তাদের দুজনকে তাঁর সভায় নিয়ে এলেন। সেখানে সেদিন সে দুটো লোকের বিচার হবে— তিন দিন আগে যারা তাঁর শোবার ঘরে ঢুকেছিল। বিচারের সময় উপস্থিত, আসামি দুটোকে আনতে পেয়াদা গিয়েছে; কিন্তু তাদের আর কোথায় পাবে? এ তিন দিন তাদের ঘরে তালাবন্ধ ছিল, সেই তালা খুলে দেখা হল, সেখানে কেউ নেই, খালি ঘর পড়ে আছে।

তখন তো ভারি একটা ছুটোছুটি হাঁকাহাঁকি পড়ে গেল। দারোগামশাই বিষম খেপে গিয়ে পেয়াদাগুলোকে বকতে লাগলেন। পেয়াদারা হাতজোড় করে বলল, 'হুজুর! আমাদের কোনো কসুর নেই; আমরা তালা দিয়ে রেখেছিলাম, তার উপর আবার আগাগোড়া দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ও দুটো তো মানুষ ছিল না, ও দুটো ভূত; নইলে এর ভিতর থেকে কী করে পালাল?'

এ কথায় সকলেরই বিশ্বাস হল। রাজামশাইও প্রথমে দারোগার ওপর রেগে তাঁকে কেটেই ফেলতে গিয়েছিলেন, শেষে ঐ কথা শুনে বললেন, 'ঠিক, ও দুটো নিশ্চয় ভূত। আমার ঘরও তো বন্ধ ছিল, তার ভিতর এতবড় ঢোল নিয়ে কী করে ঢুকেছিল?'

তা শুনে সকলেই বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ঠিক, ও দুটো ভূত!' বলতে বলতেই তাদের শরীর শিউরে উঠল, গা বেয়ে ঘাম পড়তে লাগল। তখন তারা বাঘার সেই ঢোলকটির কথা মনে করে বলল, 'মহারাজ! ভূতের ঢোল বড় সর্বনেশে জিনিস! ওটাকে কখনো আপনার ঘরে রাখবেন না। ওটাকে এখনি পুড়িয়ে ফেলুন।' রাজামশাইও বললেন, 'বাপ রে! ভূতের ঢোল ঘরে রাখব? এক্ষুনি ওটাকে এনে পোড়াও!' যেই এ কথা বলা, অমনি বাঘা দুহাতে চোখ ঢেকে 'হাউ-হাউ-হাউ-হাউ' করে কেঁদে গড়াগড়ি দিতে লাগল!

সেদিন বাঘাকে নিয়ে গুপির কী মুশকিলই হয়েছিল। ঢোল পোড়াবার নাম শুনেই বাঘা কাঁদতে আরম্ভ করেছে, ঢোল এনে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে না-জানি সে কী করবে। তখন, সেটা যে তারই ঢোল, সে কথা কি আর বাঘা সামলে রাখতে পারবে? কী সর্বনাশ! এখন বুঝি ধরা পড়ে প্রাণটাই হারাতে হয়।

গুপির বড় ইচ্ছা হচ্ছিল যে বাঘাকে নিয়ে ছুটে পালায়। কিন্তু তার তো আর জো নেই; সভায় বসবার সময় যে সেই জুতোগুলো পা থেকে খুলে রাখা হয়েছে।

এদিকে কিন্তু বাঘার কাণ্ড দেখে সভাময় এক বিষম হুলুস্থূল পড়ে গেছে। সবাই ভাবছে, বাঘার নিশ্চয়ই একটা ভারি অসুখ হয়েছে, আর সে বাঁচবে না। রাজবাড়ির বদ্যিঠাকুর এসে বাঘার নাড়ি দেখে যারপরনাই গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন। বাঘাকে খুব

করে জোলাপের ওষুধ খাইয়ে তার পেটে বেলেস্তারা লাগিয়ে দেওয়া হল। তারপর বদ্যিঠাকুর বললেন, 'এতে যদি বেদনা না সারে, তবে পিঠে আর-একটা, তাতেও না সারলে দুপাশে আর দুটো বেলেস্তারা লাগাতে হবে।'

এ কথা শুনেই বাঘার কান্না তৎক্ষণাৎ থেমে গেল। সকলে ভাবল যে, বদ্যিঠাকুর কী চমৎকার ওষুধই দিয়েছেন, দিতে দিতেই বেদনা সেরে গেছে।

যা হোক, বাঘা যখন দেখল যে তার কান্নাতে ঢোল পোড়াবার কথাটা চাপা পড়ে গেছে, তখন সেই বেলেস্তারার বেদনার ভিতরেই তার মনটা কতক ঠাণ্ডা হল। রাজামশাই তখন তাকে খুব যত্নের সাথে তার ঘরে শুইয়ে রেখে এলেন; গুপি তার কাছে বসে তার বেলেস্তারায় হাওয়া করতে লাগল।

তারপর সকলে ঘর থেকে চলে গেলে গুপি বাঘাকে বলল, 'ছি, ভাই, যেখানে-সেখানে কি এমন করে কাঁদতে আছে? দেখ দেখি, এখন কী মুশকিলটা হল।' বাঘা বলল, 'আমি যদি না কাঁদতুম, তা হলে তো এতক্ষণে আমার ঢোলকটি পুড়িয়ে শেষ করে দিত। এখন না-হয় একটু জ্বলুনি সইতে হচ্ছে, কিন্তু আমার ঢোলকটা তো বেঁচে গেছে!'

বাঘা আর গুপি এমনি কথাবার্তা বলছে। এদিকে রাজামশাই সভায় ফিরে এলে দারোগামশাই তাঁর কানে কানে বললেন, 'মহারাজ, একটা কথা আছে, অনুমতি হয় তো বলি।' রাজা বললেন, 'কী কথা?' দারোগা বললেন 'মহারাজ, ওই যে লোকটা গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদল, সে আর তার সঙ্গের ওই লোকটা, সেই দুই ভূত; আমি তাদের চিনতে পেরেছি।' রাজা বললেন, 'তাই তো হে, আমারও একটু যেন সেইরকমই ঠেকছিল। তা হলে তো বড় মুশকিল দেখছি। বলো তো এখন কী করা যায়?'

তখন এ কথা নিয়ে সভার মধ্যে ভারি একটা কানাকানি শুরু হল। কেউ বলল, 'রোজা ডাকো, ও দুটোকে তাড়িয়ে দিক।' আর-একজন বলল, 'রোজা যদি তাড়াতে না পারে, তখন তো সে দুটো খেপে গিয়ে একটা বিষম কিছু করতে পারে। তার চেয়ে কেন রাত্রে ঘুমের ভিতরে ও-দুটোকে পুড়িয়ে মারুন না।'

এ কথাটা সকলেরই খুব পছন্দ হল, কিন্তু এরমধ্যে একটু মুশকিল এই দেখা গেল যে, ভূতদের পোড়াতে গেলে রাজবাড়িতেও তখন আগুন ধরে যেতে পারে। শেষে অনেক যুক্তির পর এই স্থির হল যে, একটা বাগানবাড়িতে তাদের বাসা দেওয়া হবে; বাগানবাড়ি পুড়ে গেলেও বিশেষ ক্ষতি হবে না। রাজামশাই বললেন, 'সেই ঢোলকটাকেও তা হলে সেই বাগানবাড়িতে নিয়ে রাখা যাক; বাগানবাড়ি পোড়াবার সময় একসঙ্গে সকল আপদ চুকে যাবে।'

বাগানবাড়ি যাবার কথা শুনে গুপি আর বাঘা খুব খুশি হল। তারা তো জানে না যে এর ভিতর কী ভয়ানক ফন্দি রয়েছে; তারা খালি ভাবল যে বেশ আরামে নিরিবিলি থাকা যাবে, সংগীতচর্চারও সুবিধা হতে পারে। জায়গাটি খুবই নিরিবিলি আর সুন্দর। বাড়িটি কাঠের, কিন্তু দেখতে চমৎকার। সেখানে গিয়ে দেখতে দেখতে বাঘা ভালো হয়ে গেল। তখন গুপি তাকে বলল, 'ভাই, আর এখানে থেকে কাজ কী? চলো আমরা

এখান থেকে চলে যাই।' বাঘা বলল, 'দাদা, এমন সুন্দর জায়গায় তো আর থাকতে পাব না, দুদিন এখানে রইলাম বা। আহা, আমার ঢোলকটি যদি থাকত।'

সেদিন বাঘা বাড়ির এঘর-ওঘর ঘুরে বেড়াচ্ছে, গুপি বাগানের একজায়গায় বসে গুনগুন করছে, এমন সময় হঠাৎ বাঘা ভয়ানক চেঁচামেচি করে উঠল। তার সকল কথা বোঝা গেল না, খালি 'ও গুপিদা ! ও গুপিদা !' ডাকটা খুবই শোনা যেতে লাগল। গুপি তখন ছুটে এসে দেখল যে, বাঘা তার সেই ঢোলকটা মাথায় করে পাগলের মতো নাচছে, আর যা-তা আবোল-তাবোল বলতে বলতে 'গুপিদা গুপিদা' বলে চেঁচাচ্ছে। ঢোলক পেয়ে তার এত আনন্দ হয়েছে যে, সে আর কিছুতেই স্থির হতে পারছে না, গুছিয়ে কথাও বলতে পারছে না। এমনি করে প্রায় আধঘণ্টা চলে গেলে পর বাঘা একটু শান্ত হয়ে বলল, 'গুপিদা, দেখছ কী, এই ঘরে আমার ঢোলকটি— আর কী মজা— হাঃ হাঃ হাঃ' বলে আবার সে মিনিট দশেক খুব নেচে নিল। তারপর সে বলল, 'দাদা, এত দুঃখের পর ঢোলকটি পেয়েছি, একটা গান গাও, একটু বাজিয়ে নি'। গুপি বলল, 'এখন নয় ভাই, এখন বড্ড খিদে পেয়েছে। খাওয়াদাওয়ার পর রাত্রে বারান্দায় বসে দুজনায় খুব করে গানবাজনা করা যাবে।'

রাজামশাই কিন্তু ঠিক করেছেন, সেই রাত্রেই তাদের পুড়িয়ে মারবেন। দারোগার ওপর হুকুম হয়েছে যে, সেদিন সন্ধ্যার সময় সেই বাগানবাড়িতে মস্ত ভোজের আয়োজন করতে হবে। দারোগামশাই পঞ্চাশ-ষাটজন লোক নিয়ে সেই ভোজে উপস্থিত থাকবেন, খাওয়াদাওয়ার পর গুপি আর বাঘা ঘুমিয়ে পড়লে, তাঁরা সকলে মিলে একসঙ্গে সেই কাঠের বাড়ির চারদিকে আগুন দিয়ে তাদের পালাবার পথ বন্ধ করবেন।

সেদিনকার খাওয়া বেশ ভালোমতোই হল। গুপি আর বাঘা ভাবল যে লোকজন চলে গেলেই তারা গানবাজনা আরম্ভ করবে, দারোগামশাই ভাবলেন যে গুপি আর বাঘা ঘুমোলেই ঘরে আগুন দেবেন। তিনি তাদের ঘুম পাড়াবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর ভাব দেখে যখন স্পষ্টই বোঝা গেল যে, তারা না-ঘুমোলে তিনি সেখান থেকে যাবেন না, তখন গুপি বাঘাকে নিয়ে গিয়ে বিছানায় পড়ে নাক ডাকাতে লাগল।

একটু পরেই গুপি আর বাঘা দেখল যে লোকজন সব চলে গেছে, আর কারু সাড়াশব্দ নেই। তারপর আর-একটু দেখে, যখন মনে হল যে বাগান একেবারে খালি হয়ে গেছে, তখন তারা দুজনে বারান্দায় এসে ঢোল বাজিয়ে গান জুড়ে দিল।

এদিকে দারোগামশাই তাঁর লোকদের বলে দিয়েছেন, 'তোরা প্রত্যেক দরজায় বেশ ভালো করে আগুন ধরাবি ; খবরদার, আগুন ভালো করে না ধরলে চলে যাস নি যেন !' তিনি নিজে গিয়েছেন সিঁড়িতে আগুন ধরাতে। আগুন বেশ ভালোমতোই ধরেছে ; দারোগামশাই ভাবছেন, 'এই বেলা ছুটে পালাই'— এমন সময় বাঘার ঢোল বেজে উঠল, গুপিও গান ধরে দিল। তখন আর দারোগামশাই বা তাঁর লোকদের কারু সেখান থেকে নড়বার জো রইল না, সকলকেই পুড়ে মরতে হল। ততক্ষণে গুপি আর বাঘাও আগুন দেখতে পেয়ে, তাদের জুতোর জোরে, তাদের ঢোল আর থলেটি নিয়ে সেখান থেকে চম্পট দিল।

সেদিনকার আগুনে দারোগামশাই তো পুড়ে মারা গিয়েছিলেনই, তাঁর দলের অতি অল্প লোকই বেঁচেছিল। সেই লোকগুলো গিয়ে রাজামশাইকে এই ঘটনার খবর দিতে তাঁর মনে বড়ই ভয় হল। পরদিন আর দু-চারজন লোক রাজসভায় এসে বলল যে, তারা সেই আগুনের তামাশা দেখতে সেখানে গিয়েছিল ; তারা তখন ভারি আশ্চর্য রকমের গানবাজনা শুনেছে, আর ভূত দুটোকে শূন্যে উড়ে পালাতে স্বচক্ষে দেখেছে। তখন যা রাজামশায়ের কাঁপুনি! সেদিন তাঁর সভা করা হল না। তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতরে এসে ভূতের ভয়ে দরজা এঁটে লেপ মুড়ি দিয়ে রইলেন, এক মাসের ভিতরে আর বাইরে এলেন না।

এদিকে গুপি আর বাঘা সেই আগুনের ভিতর থেকে পালিয়ে একেবারে তাদের বাড়ির কাছের সেই বনে এসে উপস্থিত হয়েছে, যেখানে প্রথমে তাদের দেখা হয়েছিল। তাদের বড় ইচ্ছা যে এত ঘটনার পর একবার তাদের মা-বাপকে দেখে যায়। বনে এসেই বাঘা বলল, 'গুপিদা, এইখানে না তোমায় আমায় দেখা হয়েছিল?' গুপি বলল, 'হ্যাঁ!' বাঘা বলল, 'তবে এমন জায়গায় এসে কি একটু গানবাজনা না করে চলে যেতে আছে?' গুপি বলল, 'ঠিক বলেছ ভাই, তবে আর দেরি কেন? এই বেলা আরম্ভ করে দাও।' এই বলে তারা প্রাণ খুলে গানবাজনা করতে লাগল।

এর মধ্যে এক আশ্চর্য ঘটনা হয়েছে। একদল ডাকাত হাল্লার রাজার ভাণ্ডার লুটে, তার ছোট ছেলেদুটিকে সুদ্ধ চুরি করে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল, রাজা অনেক সৈন্য নিয়ে তাদের পিছু পিছু প্রাণপণে ছুটেও ধরতে পারছিলেন না। গুপি আর বাঘা যখন গান ধরেছে ঠিক সেই সময়ে সেই ডাকাতগুলোও সেই বনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে গান একবার শুনলে তো আর তার শেষ অবধি না-শুনে চলে যাবার জো নেই, কাজেই ডাকাতদের তখনি সেখানে দাঁড়াতে হল। সারা রাত্রের ভিতরে আর সে গান-বাজনাও থামল না, ডাকাতদেরও সেখান থেকে যাওয়া ঘটল না। সকালে হাল্লার রাজা এসে অতি সহজেই তাদের ধরে ফেললেন। তারপর যখন তিনি জানলেন যে, গুপি আর বাঘার গানের গুণেই তিনি ডাকাত ধরতে পেরেছেন, তখন আর তাদের আদর দেখে কে? রাজকুমারেরাও বললেন, 'বাবা, এমন আশ্চর্য গান আর কখ্খনো শোন নি; এদের সঙ্গে নিয়ে চল।' কাজেই রাজা গুপি আর বাঘাকে বললেন, 'তোমরা আমার সঙ্গে চলো! তোমাদের পাঁচশো টাকা করে মাইনে হল।'

এ কথায় গুপি জোড়হাতে রাজামশাইকে নমস্কার করে বলল, 'মহারাজ, দয়া করে আমাদের দুদিনের ছুটি দিতে আজ্ঞা হোক। আমরা আমাদের পিতামাতাকে দেখে তাঁদের অনুমতি নিয়ে আপনার রাজধানীতে গিয়ে উপস্থিত হব।' রাজা বললেন, 'আচ্ছা, এ দুদিন আমরা এই বনেই বিশ্রাম করছি; তোমরা তোমাদের মা-বাপকে দেখে দুদিন পরে এসে এইখানেই আমাদের পাবে।'

গুপিকে তাড়িয়ে অবধি তার বাবা তার জন্য বড়ই দুঃখিত ছিল, কাজেই তাকে ফিরে আসতে দেখে তার বড় আনন্দ হল। কিন্তু বাঘা বেচারার ভাগ্যে সে সুখ মেলে নি। তার মা-বাপ এর কয়েকদিন আগেই মারা গিয়েছিল। গ্রামের লোকেরা তাকে ঢোল

মাথায় করে আসতে দেখেই বলল, 'ওই রে! সেই বাঘা বেটা আবার আমাদের হাড় জ্বালিয়ে মারবে; মার বেটাকে!' বাঘা বিনয় করে বলল, 'আমি খালি আমার মা-বাবাকে দেখতে এসেছি; দুদিন থেকেই চলে যাব, বাজাব-টাজাব না।' সে কথা কি তারা শোনে? তারা দাঁত খিঁচিয়ে তার মা-বাপের মৃত্যুর কথা বলে এই বড় লাঠি নিয়ে তাকে মারতে এল, সে প্রাণপণে ছুটে পালাতে পালাতে ইঁট মেরে তার পা ভেঙে মাথা ফাটিয়ে রক্তারক্তি করে দিল।

গুপি তাদের ঘরের দাওয়ায় বসে তার বাপের সঙ্গে কথা বলছিল, এমন সময় সে দেখল যে বাঘা পাগলের মতো হয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে আসছে; তার কাপড় ছিঁড়ে ফালি ফালি আর রক্তে লাল হয়ে গেছে। অমনি সে তাড়াতাড়ি বাঘার কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে? তোমার এ দশা কেন?' গুপিকে দেখেই বাঘা একগাল হেসে ফেলেছে। তারপর সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'দাদা, বড্ড বেঁচে এসেছি! মূর্খুগুলো আর একটু হলেই আমার ঢোলটি ভেঙে দিয়েছিল!' গুপিদের বাড়ি এসে গুপির যত্নে আর তার মা-বাপের আদরে বাঘার দুদিন যতটা সম্ভব সুখেই কাটল। দুদিন পরে গুপি তার মা-বাপের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় বলে গেল, 'তোমরা তয়ের হয়ে থাকবে; আমি আবার ছুটি পেলেই এসে তোমাদের নিয়ে যাব।'

তারপর কয়েক মাস চলে গিয়েছে। গুপি আর বাঘা এখন হাল্লার রাজার বাড়িতে পরম সুখে বাস করে। দেশ-বিদেশে তাদের নাম রটে গিয়েছে— 'এমন ওস্তাদ আর কখনো হয়নি, হবেও না।' রাজামশাই তাদের ভারি ভালোবাসেন; তাদের গান না-শুনে একদিনও থাকতে পারেন না। নিজের দুঃখ-সুখের কথা সব গুপির কাছে বলেন। একদিন গুপি দেখল রাজামশায়ের মুখখানি বড়ই মলিন। তিনি ক্রমাগতই যেন কী ভাবছেন, যেন তাঁর কোনো বিপদ হয়েছে। শেষে একবার তিনি গুপিকে বললেন, 'গুপি, বড় মুশকিলে পড়েছি, কী হবে জানি না। শুণ্ডীর রাজা আমার রাজ্য কেড়ে নিতে আসছে।'

শুণ্ডীর রাজা হচ্ছেন সেই তিনি— যিনি গুপি আর বাঘাকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলেন। তাঁর নাম শুনেই গুপির মনে একটা চমৎকার মতলব এল। সে তখন রাজামশাইকে বলল, 'মহারাজ! এর জন্য কোনো চিন্তা করবেন না। আপনার এই চাকরকে হুকুম দিন, আমি এ থেকে হাসির কাণ্ড করে দেব।' রাজা হেসে বললেন, 'গুপি, তুমি গাইয়ে বাজিয়ে মানুষ, যুদ্ধের ধারও ধার না, তার কিছু বোঝও না। শুণ্ডীর রাজার বড় ভারি ফৌজ, আমি কি তার কিছু করতে পারি?' গুপি বলল, 'মহারাজ, হুকুম পেলে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। ক্ষতি তো কিছু হবে না।' রাজা বললেন, 'তোমার যা ইচ্ছা তাই তুমি করতে পার।' এ কথায় গুপি যারপরনাই খুশি হয়ে বাঘাকে ডেকে পরামর্শ করতে লাগল।

গুপি আর বাঘা সেদিন অনেকক্ষণ ধরে পরামর্শ করেছিল। বাঘার তখন কতই উৎসাহ! সে বলল, 'দাদা, এবারে আমরা দুজনে মিলে একটা কিছু করবই করব। আমার শুধু এক কথায় একটু ভয় হচ্ছে; হঠাৎ যদি প্রাণ নিয়ে পালাবার দরকার হয়,

তবে হয়তো আমি জুতোর কথা ভুলে গিয়ে সাধারণ লোকের মতো কষে ছুট দিতে যাব, আর মার খেয়ে সারা হব। এমনি করে দেখ-না সেবারে আমাদের গাঁয়ের মূর্খুগুলোর হাতে আমার কী দশা হল।'

যা হোক, গুপির কথায় বাঘার সে ভয় কেটে গেল, আর পরদিন থেকেই তারা কাজে লাগল। দিনকতক ধরে রোজ রাত্রে তারা শুণ্ডী চলে যায়, আর রাজবাড়ির আশেপাশে ঘুরে সেখানকার খবর নেয়। যুদ্ধের আয়োজন যা দেখতে পেল সে বড়ই ভয়ংকর; এ আয়োজন নিয়ে এরা হাল্লায় গিয়ে উপস্থিত হলে আর রক্ষা নেই। রাজার ঠাকুরবাড়িতে রোজ মহাধুমধামে পুজো হচ্ছে। দশ দিন এমনিতরো পুজো দিয়ে, ঠাকুরকে খুশি করে তারা হাল্লায় রওনা হবে।

গুপি আর বাঘা এর সবই দেখল, তারপর একদিন তাদের ঘরে বসে, দরজা এঁটে, সেই ভূতের দেওয়া থলিটিকে বলল, 'নতুন ধরনের মিঠাই চাই, খুব সরেস।' সে কথায় থলির ভিতর থেকে মিঠাই যা বেরুল, সে আর বলবার নয়। তেমন মিঠাই কেউ খায় নি, চোখেও দেখে নি। সেই মিঠাই নিয়ে বাঘা আর গুপি শুণ্ডীর রাজার ঠাকুরবাড়ির বিশাল মন্দিরের চুড়োয় গিয়ে বসল। নিচে খুব পুজোর ধুম—ধূপধুনো শঙ্খঘণ্টা কোলাহলের সীমা নেই, আঙিনায় লোকে লোকারণ্য। সেইসব লোকের মাথার উপরে সড়াৎ করে মিঠাইগুলো ঢেলে দিয়ে বাঘা আর গুপি মন্দিরের চুড়ো আঁকড়ে বসে তামাশা দেখতে লাগল। অন্ধকারের মধ্যে সেই ধূপধুনো আর আলোর ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে কেউ তাদের দেখতে পেল না।

মিঠাইগুলো আঙিনায় পড়তেই অমনি কোলাহল থেমে গেল। অনেকেই লাফিয়ে উঠল, কেউ কেউ চেঁচিয়ে ছুটও দিল। তারপর দু-চারজন সাহসী লোক কয়েকটা মিঠাই তুলে, আলোর কাছে নিয়ে ভয়ে ভয়ে দেখতে লাগল। শেষে তাদের একজন চোখ বুজে তার একটু মুখে পুরে দিল ; দিয়েই আর কথাবার্তা নেই— সে দুহাতে আঙিনা থেকে মিঠাই তুলে খালি মুখে দিচ্ছে আর নাচছে আর আহ্লাদে চেঁচাচ্ছে। তখন সেই আঙিনা-সুদ্ধ লোক মিঠাই খাবার জন্য পাগলের মতো কাড়াকাড়ি আর কিচিরমিচির করতে লাগল।

এদিকে কয়েকজন ছুটে গিয়ে রাজামশাইকে বলেছে, 'মহারাজ! ঠাকুর আজ পুজোয় তুষ্ট হয়ে স্বর্গ থেকে প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছেন। সে যে কী অপূর্ব প্রসাদ, সে কথা আমরা বলতেই পারছি না।' সে কথা শুনবামাত্রই রাজামশাই প্রাণপণে কাছা গুঁজতে গুঁজতে ঊর্ধ্বশ্বাসে এসে ঠাকুরবাড়িতে উপস্থিত হলেন।

কিন্তু হায়! ততক্ষণে সব প্রসাদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত উঠোন ঝাঁট দিয়েও রাজামশাইয়ের জন্য একটু প্রসাদের গুঁড়ো পাওয়া গেল না। তখন তিনি ভারি চটে গিয়ে বললেন, 'তোমাদের কী অন্যায়। পুজো করি আমি, আর প্রসাদ খেয়ে শেষ কর তোমরা! আমার জন্যে একটু গুঁড়োও রাখ না! তোমাদের সকলকে ধরে শূলে চড়াব!' এ কথায় সকলে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জোড়হাতে বলল, 'দোহাই মহারাজ! আপনার প্রসাদ কি আমরা খেয়ে শেষ করতে পারি? বাপ রে! আমরা খেতে-না-খেতেই ঝাঁ

করে কোন্‌খান দিয়ে ফুরিয়ে গেল! আজ আমাদের প্রসাদগুলো আপনি মাফ করুন; কালকের যত প্রসাদ, সব মহারাজ একাই খাবেন!' রাজা তাতে বললেন, 'আচ্ছা তাই হবে। খবরদার মনে থাকে যেন।'

পরদিন রাজামশাই প্রসাদ খাবেন, তাই একপ্রহর বেলা থাকতেই তিনি ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় এসে আকাশের পানে তাকিয়ে বসে আছেন। আর সকলে ভয়ে ভয়ে একটু দূরে বসে তাঁকে ঘিরে তামাশা দেখছে। আর পুজোর ঘটা অন্যদিনের চেয়ে শতগুণ; সবাই ভাবছে, দেবতা তাতে খুশি হয়ে রাজামশাইকে আরও ভালো প্রসাদ দেবেন।

রাত-দুপুরের সময় গুপি আর বাঘা আরো আশ্চর্যরকমের মিঠাই নিয়ে এসে মন্দিরের চূড়োয় বসল। আজ তাদের পরনে খুব জমকালো পোশাক, মাথায় মুকুট, গলায় হার, হাতে বালা, কানে কুণ্ডল; তারা দেবতা সেজে এসেছে। ধোঁয়ার জন্য কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তবু রাজামশাই আকাশের পানে তাকিয়ে আছেন। এমন সময় গুপি আর বাঘা হাসতে হাসতে তাঁর উপরে সেই মিঠাইগুলো ফেলে দিল। তাতে রাজামশাই প্রথমে একটা চিৎকার দিয়ে তিন হাত লাফিয়ে উঠলেন, তারপর তাড়াতাড়ি সামলিয়ে নিয়ে, দুহাতে মিঠাই তুলে মুখে দিতে লাগলেন, আর ধেই ধেই করে নাচনটা যে নাচলেন!

এমন সময় গুপি আর বাঘা হঠাৎ মন্দিরের চূড়ো থেকে নেমে এসে রাজার সামনে দাঁড়াল। তাদের দেখে সকলে 'ঠাকুর এসেছেন' 'ঠাকুর এসেছেন' বলে কে আগে গড় করবে ভেবে ঠিক পায় না; রাজামশাই তো লম্বা হয়ে মাটিতে পড়েই রয়েছেন, আর খালি মাথা ঠুকছেন। গুপি তাঁকে বলল, 'মহারাজ! তোমার নাচ দেখে আমরা বড়ই তুষ্ট হয়েছি; এসো তোমার সঙ্গে কোলাকুলি করি।' রাজা তা শুনে যেন হাতে স্বর্গ পেলেন; দেবতার সঙ্গে কোলাকুলি, সে কি কম সৌভাগ্যের কথা?

কোলাকুলি আরম্ভ হল। সকলে 'জয় জয়' বলে চেঁচাতে লাগল। সেই অবসরে গুপি আর বাঘা রাজামশাইকে খুব করে জড়িয়ে ধরে বলল, 'এখন তবে আমাদের ঘরে যাব!' বলতে বলতেই তারা তাঁকে সুদ্ধ একেবারে এসে তাদের নিজের ঘরে উপস্থিত। ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় সেই লোকগুলো অনেকক্ষণ ধরে হাঁ করে আকাশের পানে চেয়ে রইল। তারপর যখন রাজামশাই আর ফিরলেন না, তখন তারা যে-যার ঘরে এসে বলল, 'কী আশ্চর্যই দেখলাম! রাজামশাই সশরীরে স্বর্গে গেলেন! দেবতারা নিজে তাঁকে নিতে এসেছিলেন!

এদিকে রাজামশাই গুপি আর বাঘার কোলে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, তাদের ঘরে এসেও অনেকক্ষণ তাঁর জ্ঞান হয় নি। ভোরের বেলায় তিনি চোখ মেলে দেখলেন যে, সেই দুটো ভূত তাঁর মাথার কাছে বসে আছে। অমনি তিনি তাদের পায়ে পড়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'দোহাই বাবা! আমাকে খেয়ো না! আমি দুশো মোষ মেরে তোমাদের পুজো করব।'

গুপি বলল, 'মহারাজ, আপনার কোনো ভয় নেই। আমরা ভূতও নই, আপনাকে খেতেও যাচ্ছি না।' রাজামশাইয়ের কিন্তু তাতে একটুও ভরসা হল না। তিনি আর কোনো কথা না বলে মাথা গুঁজে বসে কাঁপতে লাগলেন।

এদিকে বাঘা এসে হাল্লার রাজাকে বলল, 'কাল রাত্রে আমরা শুণ্ডীর রাজাকে ধরে এনেছি ; এখন কী আজ্ঞা হয় ?' হাল্লার রাজা বললেন, 'তাকে নিয়ে এসো।'

দুই রাজায় যখন দেখা হল তখন শুণ্ডীর রাজা বুঝতে পারলেন যে তাঁকে ধরে এনেছে। হাল্লা জয় করা তো তাঁর ভাগ্যে ঘটলই না, এখন প্রাণটিও যাবে। কিন্তু হাল্লার রাজা তাঁকে প্রাণে না মেরে শুধু তাঁর রাজ্যই কেড়ে নিলেন। তারপর তিনি গুপি আর বাঘাকে বললেন, 'তোমরাই আমাকে বাঁচিয়েছ, নইলে হয়তো আমার রাজ্যও যেত, প্রাণও যেত। আমি আর তোমাদের কী উপকার করতে পারি? শুণ্ডীরাজ্যের অর্ধেক আর আমার দুটি কন্যা তোমাদের দুজনকে দান করলাম।'

তখন খুবই একটা ধুমধাম হল। গুপি আর বাঘা হাল্লার রাজার জামাই হয়ে আর শুণ্ডীর অর্ধেক রাজ্য পেয়ে পরম আনন্দে সংগীতের চর্চা করতে লাগল। গুপির মা-বাপের মান্য আর সুখ তখন দেখে কে?

টুনটুনি আর রাজার কথা

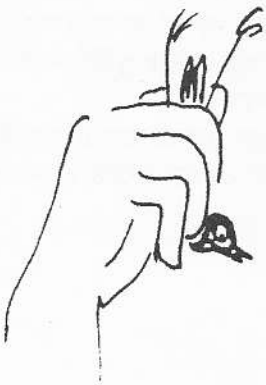

রাজার বাগানের কোণে টুনটুনির বাসা ছিল। রাজার সিন্দুকের টাকা রোদে শুকুতে দিয়েছিল, সন্ধ্যার সময় তাঁর লোকেরা তার একটি টাকা ঘরে তুলতে ভুলে গেল। টুনটুনি সেই চকচকে টাকাটি দেখতে পেয়ে তার বাসায় এসে রেখে দিলে, আর ভাবলে, 'ঈস! আমি কত বড়লোক হয়ে গেছি। রাজার ঘরে যে ধন আছে, আমার ঘরেও সে ধন আছে!' তারপর থেকে সে খালি এই কথাই ভাবে, আর বলে—

রাজার ঘরে যে ধন আছে
টুনির ঘরেও সে ধন আছে!

রাজা তাঁর সভায় বসে সে-কথা শুনতে পেয়ে জিগ্‌গেস করলেন, 'হ্যাঁরে? পাখিটা কী বলছে রে?'

সকলে হাতজোড় করে বললে, 'মহারাজ, পাখি বলছে, আপনার ঘরে যে ধন আছে, ওর ঘরেও নাকি সেই ধন আছে!' শুনে রাজা খিলখিল করে হেসে বললেন, 'দেখ তো ওর বাসায় কী আছে।'

তারা দেখে এসে বললে, 'মহারাজ, বাসায় একটি টাকা আছে।'

শুনে রাজা বললেন, 'সে তো আমারই টাকা, নিয়ে আয় সেটা।'

তখুনি লোক গিয়ে টুনটুনির বাসা থেকে টাকাটি নিয়ে এল। সে বেচারা আর কী করে, সে মনের দুঃখে বলতে লাগল—

রাজা বড় ধনে কাতর
টুনির ধন নিলে বাড়ির ভিতর!

শুনে রাজা আবার হেসে বললেন, 'পাখিটা তো বড় ঠ্যাঁটা রে! যা ওর টাকা ফিরিয়ে দিয়ে আয়।'

টাকা ফিরে পেয়ে টুনির বড় আনন্দ হয়েছে। তখন সে বলছে—

রাজা ভারি ভয় পেল
টুনির টাকা ফিরিয়ে দিল।

রাজা জিগ্‌গেস করলেন, 'আবার কী বলছে রে?'

সভার লোকেরা বললে, 'বলছে যে মহারাজ নাকি বড্ড ভয় পেয়েছেন, তাই ওর টাকা ফিরিয়ে দিয়েছেন।'

শুনে তো রাজামশাই রেগে একেবারে অস্থির! বললেন, 'কি, এত বড় কথা! আন তো ধরে, বেটাকে ভেজে খাই!'

যেই বলা অমনি লোক গিয়ে টুনটুনি বেচারাকে ধরে আনলে। রাজা তাকে মুঠোয় করে নিয়ে বাড়ির ভিতর গিয়ে রানিদের বললেন, 'এই পাখিটাকে ভেজে আজ আমাকে খেতে দিতে হবে!'

বলে তো রাজা চলে এসেছেন, আর রানিরা সাতজনে মিলে সেই পাখিটাকে দেখছেন।

একজন বললেন, 'কী সুন্দর পাখি! আমার হাতে দাও তো একবার দেখি।' বলে তিনি তাকে হাতে নিলেন। তা দেখে আবার একজন দেখতে চাইলেন। তাঁর হাত থেকে যখন আর-একজন নিতে গেলেন, তখন টুনটুনি ফস্‌কে গিয়ে উড়ে পালাল।

কী সর্বনাশ! এখন উপায় কী হবে? রাজা জানতে পারলে তো রক্ষা থাকবে না।

এমনি করে তাঁরা দুঃখ করছেন, এমন সময় একটা ব্যাঙ সেইখান দিয়ে থপ-থপ করে যাচ্ছে। সাত রানি তাকে দেখতে পেয়ে খপ করে ধরে ফেললেন, আর বললেন, 'চুপ চুপ! কেউ যেন জানতে না পারে। এইটেকে ভেজে দি, আর রাজামশাই খেয়ে ভাববেন টুনটুনিই খেয়েছেন!'

সেই ব্যাঙটার ছাল ছাড়িয়ে তাকে ভেজে রাজামশাইকে দিলে তিনি খেয়ে ভারি খুশি হলেন।

তারপর সবে তিনি সভায় গিয়ে বসেছেন, আর ভাবছেন, 'এবারে পাখির বাছাকে জব্দ করেছি।'

অমনি টুনি বলছে—

বড় মজা, বড় মজা,
রাজা খেলেন ব্যাঙ ভাজা!

শুনেই তো রাজামশাই লাফিয়ে উঠেছেন। তখন তিনি থুতু ফেলেন, ওয়াক তোলেন, মুখ ধোন, আরো কত কী করেন। তারপর রেগে বললেন, 'সাত রানির নাক কেটে ফেল।'

অমনি জল্লাদ গিয়ে সাত রানির নাক কেটে ফেললে।

তা দেখে টুনটুনি বললে—

এক টুনিতে টুনটুনাল
সাত রানির নাক কাটাল!

তখন রাজা বললেন, 'আন্ বেটাকে ধরে! এবার গিলে খাব! দেখি কেমন করে পালায়!'

টুনটুনিকে ধরে আনলে।

রাজা বললেন, 'আন্ জল!'

জল এল। রাজা মুখ ভরে জল নিয়ে টুনটুনিকে মুখে পুরেই চোখ বুজে ঢক করে গিলে ফেললেন।

সবাই বললে, 'এবারে পাখি জব্দ!'

বলতে বলতেই রাজামশাই ভোক্ করে মস্ত একটা ঢেকুর তুললেন।

সভার লোক চমকে উঠল, আর টুনটুনি সেই ঢেকুরের সঙ্গে বেরিয়ে এসে উড়ে পালাল।

রাজা বললেন, 'গেল, গেল। ধর, ধর!' অমনি দুশো লোক ছুটে গিয়ে আবার বেচারাকে ধরে আনল।

তারপর আবার জল নিয়ে এল, আর সিপাই এসে তলোয়ার নিয়ে রাজামশায়ের কাছে দাঁড়াল, টুনটুনি বেরুলেই তাকে দুটুকরো করে ফেলবে।

এবার টুনটুনিকে গিলেই রাজামশাই দুই হাতে মুখ চেপে বসে থাকলেন, যাতে টুনটুনি আর বেরুতে না পারে। সে বেচারা পেটের ভিতরে গিয়ে ভয়ানক ছটফট করতে লাগল!

খানিক বাদে রাজামশাই নাক সিঁটকিয়ে বললেন, 'ওয়াক্।' অমনি টুনটুনিকে সুদ্ধ তাঁর পেটের ভিতরের সকল জিনিস বেরিয়ে এল।

সবাই বললে, 'সিপাই, সিপাই! মারো, মারো! পালাল!'

সিপাই তাতে থতমত খেয়ে তলোয়ার দিয়ে যেই টুনটুনিকে মারতে যাবে, অমনি সেই তলোয়ার টুনটুনির গায়ে না পড়ে, রাজামশায়ের নাকে পড়ল।

রাজামশাই তো ভয়ানক চ্যাঁচালেন, সঙ্গে সঙ্গে সভার সকল লোক চ্যাঁচাতে লাগল। তখন ডাক্তার এসে ওষুধ দিয়ে পটি বেঁধে অনেক কষ্টে রাজামশাইকে বাঁচাল।

টুনটুনি তা দেখে বলতে লাগল—

নাক-কাটা রাজা রে
দেখ তো কেমন সাজা রে!

বলেই সে উড়ে সে-দেশ থেকে চলে গেল। রাজার লোক ছুটে এসে দেখল, খালি বাসা পড়ে আছে।

বোকা কুমিরের কথা

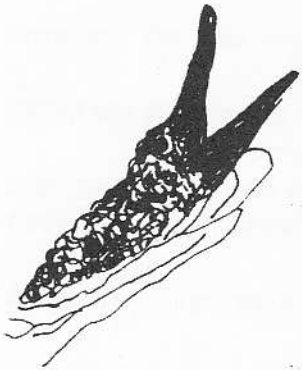

কুমির আর শিয়াল মিলে চাষ করতে গেল। কিসের চাষ করবে? আলুর চাষ। আলু হয় মাটির নিচে। তার গাছ থাকে মাটির উপরে, তা দিয়ে কোনো কাজ হয় না। বোকা কুমির সে কথা জানত না। সে ভাবলে বুঝি আলু তার গাছের ফল।

তাই সে শিয়ালকে ঠকাবার জন্যে বললে, 'গাছের আগার দিক কিন্তু আমার, আর গোড়ার দিক তোমার।'

শুনে শিয়াল হেসে বললে, 'আচ্ছা, তাই হবে।'

তারপর যখন আলু হল, কুমির তখন সব গাছের আগা কেটে তার বাড়িতে নিয়ে এল। এনে দেখে তাতে একটাও আলু নেই। তখন সে মাঠে গিয়ে দেখল, শিয়াল মাটি খুঁড়ে সব আলু তুলে নিয়ে গেছে। কুমির ভাবলে, 'তাই তো। এবার বড্ড ঠকে গিয়েছি। আচ্ছা আসছে বার দেখব!'

তার পরের বার হল ধানের চাষ। এবারে কুমির মনে ভেবেছে, আর কিছুতেই ঠকতে যাবে না। তাই সে আগে থাকতেই শিয়ালকে বললে, 'ভাই, এবারে কিন্তু আমি আগার দিক নেব না, এবার আমাকে গোড়ার দিক দিতে হবে!'

শুনে শিয়াল হেসে বললে, 'আচ্ছা তাই হবে!'

তারপর যখন ধান হল, শিয়াল সে ধানসুদ্ধ গাছের আগা কেটে নিয়ে গেল। কুমির তো এবারে ভারি খুশি হয়ে আছে। ভেবেছে, মাটি খুঁড়ে সব ধান তুলে নেবে। ও কপাল! মাটি খুঁড়ে দেখে সেখানে কিছুই নেই। লাভের মধ্যে খড়গুলো গেল।

তখন কুমির তো বড্ড চটেছে, আর বলছে, 'দাঁড়াও, শিয়ালের বাছা, তোমাকে দেখাচ্ছি। এবারে আর আমি তোমাকে আগা নিতে দেব না। সব আগা আমি নিয়ে আসব!'

সেবার হল আখের চাষ।

কুমির তো আগেই বলেছে, এবার সে আগা না নিয়ে ছাড়বে না। কাজেই শিয়াল তাকে আগাগুলো দিয়ে, নিজে আখগুলো নিয়ে ঘরে বসে মজা করে খেতে লাগল।

কুমির আখের আগা ঘরে এনে চিবিয়ে দেখলে, খালি নোন্তা, তাতে একটুও মিষ্টি নেই। তখন সে রাগ করে আগাগুলো সব ফেলে দিয়ে শিয়ালকে বললে, 'না ভাই, তোমার সঙ্গে আর আমি চাষ করতে যাব না, তুমি বড্ড ঠকাও!'

শিয়াল পণ্ডিত

কুমির দেখলে, সে শিয়ালের সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠছে না। তখন সে ভাবলে, 'ও ঢের লেখাপড়া জানে, তাতেই খালি আমাকে ফাঁকি দেয়। আমি মূর্খ লোক, তাই তাকে আঁটতে পারি না।' অনেকক্ষণ ভেবে কুমির এই ঠিক করল যে, নিজের সাতটা ছেলেকে শিয়ালের কাছে দিয়ে খুব করে লেখাপড়া শেখাতে হবে। তার পরের দিনই সে ছানা সাতটাকে সঙ্গে করে শিয়ালের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হল। শিয়াল তখন তার গর্তের ভিতরে বসে কাঁকড়া খাচ্ছিল। কুমির এসে ডাকলে, 'শিয়াল পণ্ডিত, শিয়াল পণ্ডিত, বাড়ি আছ?'

শিয়াল বাইরে এসে বললে, 'কী ভাই, কী মনে করে?'

কুমির বললে, 'ভাই, এই আমার ছেলে সাতটাকে তোমার কাছে এনেছি। মূর্খ হলে করে খেতে পারবে না। ভাই, তুমি যদি এদের একটু লেখাপড়া শিখিয়ে দাও।'

শিয়াল বললে, 'সে আর বলতে? আমি সাত দিনে সাতজনকে পড়িয়ে পণ্ডিত করে দেব।' শুনে কুমির তো খুব খুশি হয়ে ছানা সাতটাকে রেখে চলে গেল।

তখন শিয়াল তাদের একটাকে আড়ালে নিয়ে বললে—

'পড় তো বাপু—কানা খানা গানা ঘানা,
কেমন লাগে কুমির ছানা?'

এই কথা বলে, সেটার ঘাড় ভেঙে, খেয়ে ফেললে।

পরদিন যখন কুমির তার ছানা দেখতে এল, তখন শিয়াল তাদের একেকটি করে গর্তের বাইরে এনে দেখাতে লাগল। ছয়টিকে ছয়বার দেখালে, শেষেরটা দেখালে দুবার। বোকা কুমির তা বুঝতে না-পেরে ভাবলে, সাতটাই দেখানো হয়েছে। তখন সে চলে গেল, আর অমনি শিয়াল ছানাগুলোর একটাকে আড়ালে নিয়ে বললে—

'পড় তো বাপু—কানা খানা গানা ঘানা,
কেমন লাগে কুমির ছানা?'

এই কথা বলে, সেটার ঘাড় ভেঙে, খেয়ে ফেলল।

পরদিন কুমির তো ছানা দেখতে এল। শিয়াল একেকটি করে গর্তের বাইরে এনে, পাঁচবার পাঁচটাকে দেখাল, শেষেরটিকে দেখাল তিনবার। তাতেই কুমির খুশি হয়ে চলে গেল। তখন শিয়াল ঠিক আগের মতো করে আর-একটা ছানাকে খেল।

এমনি করে সে রোজ একটি ছানা খায়, আর কুমির এলে তাকে ফাঁকি দিয়ে ভোলায়। শেষে যখন একটি ছানা বই আর রইল না, তখন সেই একটিকেই সাতবার দেখিয়ে সে কুমিরকে বোঝাল। তারপর কুমির চলে গেলে সেটিকেও খেয়ে ফেলল। তারপর আর একটিও রইল না।

তখন শিয়ালনী বললে, 'এখন উপায়? কুমির এলে দেখাবে কী? ছানা না–দেখতে পেলে তো অমনি আমাদের ধরে খাবে!'

শিয়াল বললে, 'আমাদের পেলে তো ধরে খাবে! নদীর ওপারের বনটা খুব বড়, চল আমরা সেইখানে যাই। তা হলে কুমির আর আমাদের খুঁজে বার করতেই পারবে না।'

এই বলে শিয়াল শিয়ালনীকে নিয়ে তাদের পুরনো গর্ত ছেড়ে চলে গেল।

এর খানিক বাদেই কুমির এসেছে। সে এসে 'শিয়াল পণ্ডিত, শিয়াল পণ্ডিত' বলে কত ডাকল, কেউ তার কথার উত্তর দিল না! তখন সে গর্তের ভিতর–বার খুঁজে দেখল— শিয়ালও নেই, শিয়ালনীও নেই! খালি তার ছানাদের হাড়গুলো পড়ে আছে।

তখন তার খুব রাগ হল, আর সে চারদিকে ছুটোছুটি করে শিয়ালকে খুঁজতে লাগল। খুঁজতে খুঁজতে নদীর ধারে গিয়ে দেখল, ওই! শিয়াল আর শিয়ালনী সাঁতরে নদী পার হচ্ছে।

অমনি 'দাঁড়া হতভাগা!' বলে সে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। জলের নিচে ছুটতে কুমিরের মতো আর কেউ পারে না, দেখতে দেখতে সে গিয়ে শিয়ালের পিছনের একটা পা কামড়ে ধরল!

শিয়াল সবে তার সামনের দু–পা ডাঙায় তুলেছিল, শিয়ালনী তার আগেই উঠে গিয়েছিল। কুমির এসে শিয়ালের পা ধরতেই সে শিয়ালনীকে ডেকে বললে, 'শিয়ালনী, শিয়ালনী, আমার লাঠিগাছা ধরে কে টানাটানি করছে! লাঠিটা–বা নিয়েই যায়!'

এ–কথা শুনে কুমির ভাবলে, 'তাই তো, পা ধরতে গিয়ে লাঠি ধরে ফেলেছি! শিগ্‌গির লাঠি ছেড়ে পা ধরি।'

এই ভেবে যেই সে শিয়ালের পা ছেড়ে দিয়েছে, অমনি শিয়াল একলাফে ডাঙায় উঠে গিয়েছে। উঠেই বোঁ করে দে ছুট। তারপর বনের ভিতরে ঢুকে পড়লে আর কার সাধ্য তাকে ধরে।

তারপর থেকে কুমির কেবলই শিয়ালকে খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু শিয়াল বড্ড চালাক, তাই তাকে ধরতে পারে না। তখন সে অনেক ভেবে এক ফন্দি করল।

কুমির একদিন চড়ায় গিয়ে হাত–পা ছড়িয়ে মড়ার মতো পড়ে রইল। তারপর শিয়াল আর শিয়ালনী কচ্ছপ খেতে এসে দেখল, কুমির কেমন হয়ে পড়ে আছে! তখন শিয়ালনী বললে, 'মরে গেছে! চল খাইগে!' শিয়াল বললে, 'রোস, একটু দেখে নিই।' এই বলে কুমিরের আর–একটু কাছে গিয়ে বলতে লাগল, 'না! এটা দেখছি বড্ড বেশি মরে গেছে! অত বেশি মরাটা আমরা খাই না। যেগুলো একটু–একটু নড়ে–চড়ে, আমরা সেগুলো খাই।' তা শুনে কুমির ভাবলে, 'একটু নড়ি–চড়ি, নইলে খেতে আসবে না।' এই মনে করে কুমির তার লেজের আগাটুকু নাড়তে লাগল। তা দেখে

শিয়াল হেসে বললে, 'ওই দেখ, লেজ নাড়ছে! তুমি তো বলেছিলে মরে গেছে!' তারপর আর কি তারা সেখানে দাঁড়ায়! তখন কুমির বললে, 'বড্ড ফাঁকি দিলে তো! আচ্ছা এবারে দেখাব!'

একটা জায়গায় শিয়াল রোজ জল খেতে আসত! কুমির তা দেখতে পেয়ে সেখানে গিয়ে লুকিয়ে রইল। ভাবল শিয়াল জল খেতে এলেই ধরে খাবে। সেদিন শিয়াল এসে দেখল সেখানে একটাও মাছ নেই! অন্য দিন ঢের মাছ চলাফেরা করে। শিয়াল ভাবল, 'ভালো রে ভালো, আজ সব মাছ গেল কোথায়? বুঝেছি, এখানে কুমির আছে!' তখন সে বললে, 'এখানকার জলটা বেজায় পরিষ্কার। একটু ঘোলা না হলে কি খাওয়া যায়? চল শিয়ালনী, আর-এক জায়গায় যাই।' এ-কথা শুনেই কুমির তাড়াতাড়ি সেখানকার জল ঘোলা করতে আরম্ভ করলে। তা দেখে শিয়াল হাসতে হাসতে ছুটে পালিয়েছে!

আর একদিন শিয়াল এসেছে কাঁকড়া খেতে। কুমির তার আগেই সেখানে চুপ করে বসে আছে। শিয়াল তা টের পেয়ে বললে, 'এখানে কাঁকড়া নেই, থাকলে দু-একটা ভাসত।'

অমনি কুমির তার লেজের আগাটুকু ভাসিয়ে দিল। কাজেই শিয়াল আর জলে নামল না।

এমনি করে বারবার শিয়ালের কাছে ঠকে গিয়ে, শেষে কুমিরের ভারি লজ্জা হল। তখন সে আর কী করে মুখ দেখাবে? কাজেই সে তার ঘরের ভিতরে গিয়ে বসে রইল।

দুষ্ট বাঘ

রাজার বাড়ির সিংহ-দরজার পাশে, লোহার খাঁচায় একটা মস্ত বাঘ ছিল। রাজার বাড়ির সামনে দিয়ে যত লোক যাওয়া-আসা করত, বাঘ হাতজোড় করে তাদের সকলকেই বলত, 'একটিবার খাঁচার দরজাটা খুলে দাও না দাদা!' শুনে তারা বলত, 'তা বইকি! দরজাটা খুলে দি, আর তুমি আমাদের ঘাড় ভাঙো।'

এর মধ্যে রাজার বাড়িতে খুব নিমন্ত্রণের ধুম লেগেছে। বড় বড় পণ্ডিতমশাইয়েরা দলে-দলে নিমন্ত্রণ খেতে আসছেন। তাঁদের মধ্যে একজন ঠাকুর দেখতে ভারি ভালোমানুষের মতো ছিলেন। বাঘ এই ঠাকুরমশাইকে বারবার প্রণাম করতে লাগল।

তা দেখে ঠাকুরমশাই বললেন, 'আহা, বাঘটি তো বড় লক্ষ্মী! তুমি কী চাও বাপু।'

বাঘ হাতজোড় করে বললে, 'আজ্ঞে, একটিবার যদি এই খাঁচার দরজাটা খুলে দেন! আপনার দুটি পায়ে পড়ি।'

ঠাকুরমশাই কিনা বড্ড ভালোমানুষ ছিলেন, তাই তিনি বাঘের কথায় তাড়াতাড়ি খাঁচার দরজা খুলে দিলেন।

তখন হতভাগা বাঘ হাসতে-হাসতে বাইরে এসেই বললে, 'ঠাকুর, তোমাকে তো খাব!'

আর কেউ হলে হয়তো ছুটে পালাত। কিন্তু এই ঠাকুরটি ছুটতে জানতেন না। তিনি ভারি ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'এমন কথা তো কখনো শুনিনি! আমি তোমার এত উপকার করলাম আর তুমি বলছ কিনা আমাকে খাবে! এমন কাজ কি কেউ কখনো করে?'

বাঘ বললে, 'করে বইকি ঠাকুর, সকলেই তো করে থাকে।'

ঠাকুরমশাই বললেন, 'তা কখনোই নয়! চল দেখি তিনজন সাক্ষীকে জিগ্‌গেস করি, তারা কী বলে।'

বাঘ বললে, 'আচ্ছা চলুন। আপনি যা বলছেন, সাক্ষীরা যদি তাই বলে, আমি আপনাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যাব। আর যদি তারা আমার কথা ঠিক বলে, তবে আপনাকে ধরে খাব।'

সাক্ষী খুঁজতে দুজনে মাঠে গেলেন। দুই ক্ষেতের মাঝখানে খানিকটা মাটি উঁচু রেখে, চাষিরা একটি ছোট পথের মতো করে দেয়, তাকে বলে আল। ঠাকুরমশাই সেই আল দেখিয়ে বললেন, 'এই আমার একজন সাক্ষী।'

বাঘ বললে, 'আচ্ছা, ওকে জিগ্‌গেস করুন, ও কী বলে।'

ঠাকুরমশাই তখন জিগ্‌গেস করলেন, 'ওহে বাপু আল, তুমি বল দেখি, আমি যদি কারো ভালো করি সে কি উল্টো আমার মন্দ করে?'

আল বললে, 'করে বইকি ঠাকুর। এই আমাকে দিয়ে দেখুন না। দুই চাষার ক্ষেতের মাঝখানে আমি থাকি, তাতে তাদের কত উপকার হয়। একজনের জমি আর একজন নিয়ে যেতে পারে না, একজনের ক্ষেতের জল আর একজনের ক্ষেতে চলে যায় না। আমি তাদের এত উপকার করি, তবু হতভাগারা লাঙ্গল দিয়ে আমাকেই কেটে তাদের ক্ষেত বাড়িয়ে নেয়!'

বাঘ বললে, 'শুনলেন তো ঠাকুরমশাই, ভালো করলে তার মন্দ কেউ করে কি না!'

ঠাকুরমশাই বললেন, 'রোসো, আমার তো আরো দুজন সাক্ষী আছে।'

বাঘ বললে, 'আচ্ছা চলুন।'

মাঠের মাঝখানে একটা বটগাছ ছিল। ঠাকুরমশাই তাকে দেখিয়ে বললেন, 'ওই আমার আর-একজন সাক্ষী।'

বাঘ বললে, 'আচ্ছা, ওকে জিগ্‌গেস করুন। দেখি, ও কী বলে।'

ঠাকুরমশাই বললেন, 'বাপু বটগাছ, তোমার তো অনেক বয়েস হয়েছে, অনেক দেখেছ শুনেছ। বল দেখি, উপকার যে করে তার অপকার কি কেউ করে?'

বটগাছ বললে, 'তাই তো লোক আগে করে। ওই লোকগুলো আমার ছায়ায় বসে ঠাণ্ডা হয়েছে, আর আমাকেই খুঁচিয়ে আমার আঠা বার করেছে। আবার সেই আঠা রাখবার জন্যে আমারই পাতা ছিঁড়েছে। তারপর ওই দেখুন, আমার ডালটা ভেঙে নিয়ে চলেছে।'

বাঘ বললে, 'কি ঠাকুরমশাই, ও কী বলছে!'

তখন ঠাকুরমশাই তো মুশকিলে পড়লেন। আর কী বলবেন, ভেবে ঠিক করতে পারলেন না। এমন সময় সেখান দিয়ে একটা শিয়াল যাচ্ছিল। ঠাকুরমশাই সেই শিয়ালকে দেখিয়ে বললেন, 'ওই আমার আর একজন সাক্ষী। দেখি, ও কী বলে।'

তারপর তিনি শিয়ালকে ডেকে বললেন, 'শিয়ালপণ্ডিত, একটু দাঁড়াও। তুমি আমার সাক্ষী।'

শিয়াল দাঁড়াল, কিন্তু কাছে আসতে রাজি হল না। সে দূর থেকেই জিগ্‌গেস করল, 'সে কী কথা! আমি কী করে আপনার সাক্ষী হলুম?'

ঠাকুরমশাই বললেন, 'বল দেখি বাপু, যে ভালো করে তার মন্দ কি কেউ করে?'

শিয়াল বললে, 'কার কী ভালো কে করেছিল, আর কার কী মন্দ কে করেছে, শুনলে তবে বলতে পারি।'

ঠাকুরমশাই বললেন, 'বাঘ খাঁচার ভিতরে ছিল, আর আমি ব্রাহ্মণ পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম—'

এই কথা শুনেই শিয়াল বললে, 'এটা বড় শক্ত কথা হল। সেই খাঁচা আর সেই পথ না দেখলে, আমি কিছুই বলতে পারব না।'

কাজেই সকলকে আবার সেই খাঁচার কাছে আসতে হল। শিয়াল অনেকক্ষণ সেই খাঁচার চারধারে পায়চারি করে বললে, 'আচ্ছা, খাঁচা আর পথ বুঝতে পেরেছি। এখন কী হয়েছে বলুন।'

ঠাকুরমশাই বললেন, 'বাঘ খাঁচার ভিতরে ছিল, আর আমি ব্রাহ্মণ পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম।'

অমনি শিয়াল তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললে, 'দাঁড়ান, অত তাড়াতাড়ি করবেন না, আগে ওইটুকু বেশ করে বুঝে নিই। কী বললেন? বাঘ আপনার বামুন ছিল, আর পথটা খাঁচার ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল?'

এই কথা শুনে বাঘ হো-হো করে হেসে বললে, 'দূর গাধা! বাঘ খাঁচার ভিতর ছিল, আর বামুন পথ দিয়ে যাচ্ছিল!'

শিয়াল বললে, 'রোসো দেখি— বামুন খাঁচার ভিতর ছিল, আর বাঘ পথ দিয়ে যাচ্ছিল।'

বাঘ বললে, 'আরে বোকা, তা নয়। বাঘ খাঁচার ভিতরে ছিল, বামুন পথ দিয়ে যাচ্ছিল?'

শিয়াল বললে, 'এ তো ভারি গোলমালের কথা হল দেখছি। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কী বললে? বাঘ বামুনের ভিতরে ছিল, আর খাঁচা পথ দিয়ে যাচ্ছিল?'

বাঘ বললে, 'এমন বোকা তো আর কোথাও দেখিনি! আরে বাঘ ছিল খাঁচার ভিতরে, আর বামুন যাচ্ছিল পথ দিয়ে।'

তখন শিয়াল মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললে, 'না! অত শক্ত কথা আমি বুঝতে পারব না!'

ততক্ষণে বাঘ রেগে গিয়েছে।

সে শিয়ালকে এক ধমক দিয়ে বললে, 'ও কথা তোকে বুঝতেই হবে! দেখ, আমি এই খাঁচার ভিতরে ছিলুম— দেখ— এই এমনি করে—'

বলতে বলতে বাঘ খাঁচার ভিতরে গিয়ে ঢুকল, আর শিয়ালও অমনি খাঁচার দরজা বন্ধ করে হুড়কো এঁটে দিল। তারপর শিয়াল ঠাকুরমশাইকে বলল, 'ঠাকুরমশাই, এখন আমি সব বুঝতে পেরেছি। আমার সাক্ষী যদি শুনতে চান, তবে তা হচ্ছে এই যে, দুষ্ট লোকের উপকার করতে নেই। কাজেই বাঘ মামার জিত। এখন আপনি শিগগির যান, এখনো ফলার ফুরোয়নি।' বলে শিয়াল বনে চরতে গেল, আর ঠাকুরমশাই ফলার খেতে গেলেন।

বাঘের উপর টাগ

এক জোলা ছিল। তার একটি বড় আদুরে ছেলে ছিল। সে যখন যা চাইত, সেটি না নিয়ে কিছুতেই ছাড়ত না।

একদিন এক বড়মানুষের ছেলে জোলার বাড়ির সামনে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিল। তাকে দেখে জোলার ছেলে তার বাপকে ডেকে বললে, 'বাবা, আমার কেন ঘোড়া নেই? আমাকে ঘোড়া এনে দাও।'

জোলা বললে, 'আমি গরিব মানুষ, ঘোড়া কী করে আনব? ঘোড়া কিনতে ঢের টাকা লাগে।'

ছেলে বললে, 'তা হবে না। আমাকে ঘোড়া এনে দিতেই হবে।' বলে, সেই ছেলে আগে নেচে নেচে কাঁদল, তারপর গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদল, তারপর উঠে তার বাপের হুঁকো-কলকে ভেঙে ফেলল। তাতেও ঘোড়া কিনে দিচ্ছে না দেখে, শেষে খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিল।

তখন জোলা তো ভারি মুশকিলে পড়ল। ছেলে কিছুতেই খাচ্ছে না দেখে, সে ভাবল, 'এখন তো আর ঘোড়া কিনে না দিলেই হচ্ছে না। দেখি ঘরে কিছু টাকা আছে কি না।'

অনেক খুঁজে সে কয়েকটি টাকা বার করল। তারপর সেই টাকা কাপড়ে বেঁধে সে ঘোড়া কিনতে হাটে চলল।

হাটে গিয়ে জোলা ঘোড়াওলাকে জিগ্‌গেস করল, 'হ্যাঁ গা, তোমার ঘোড়ার দাম ক-টাকা?'

ঘোড়াওয়ালা বললে, 'পঞ্চাশ টাকা।'

জোলা কাপড়ে বেঁধে মোটে পাঁচটি টাকা এনেছে, পঞ্চাশ টাকা সে কোথা থেকে দেবে? কাজেই সে ঘোড়া কিনতে না পেরে মনের দুঃখে বাড়ি ফিরে চলল।

এমন সময় হয়েছে কি— দুজন লোক সেইখানে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করছে। তাদের একজন বললে, 'তোমার কিন্তু বড় মুশকিল হবে!'

তা শুনে আর-একজন বললে, 'ঘোড়ার ডিম হবে।'

ঘোড়ার কিনা ডিম হয় না, তাই 'ঘোড়ার ডিম হবে' বললে বুঝতে হয় যে 'কিচ্ছু হবে না', কিন্তু জোলা সে কথা জানত না। সে ঘোড়ার ডিমের নাম শুনেই ব্যস্ত হয়ে বললে, 'ভাই ঘোড়ার ডিম কোথায় পাওয়া যায় বলতে পার?'

সেখানে একটা ভারি দুষ্টু লোক ছিল। সে জোলাকে বললে, 'আমার সঙ্গে এস, আমার ঘরে ঘোড়ার ডিম আছে।'

সে দুষ্টু লোকটার ঘরে ছিল একটা ফুটি। সে জোলাকে তার সঙ্গে বাড়ি নিয়ে, সেই ফুটিটা তার হাতে দিয়ে বললে, 'এই নাও ঘোড়ার ডিম। দেখ, কেমনে ফেটে রয়েছে। এখুনি এর ভিতর থেকে ছানা বেরুবে। দেখো ছুটে পালায় না যেন!'

তখন জোলার আনন্দ দেখে কে!

সে জিগগেস করলে, 'এর দাম কত?'

দুষ্টু লোকটা বললে, 'পাঁচ টাকা।' জোলা তখুনি সেই পাঁচটা টাকা খুলে দিয়ে ফুটি নিয়ে ঘরে চলল। ফুটি ফেটে রয়েছে, ভিতরে লাল দেখা যাচ্ছে। জোলা ভাবলে, ওই রে ছানা যদি বেরিয়ে পালাতে চায়, তখুনি খপ করে ধরে ফেলব। তারপর গলায় চাদর বেঁধে তাকে বাড়ি নিয়ে যাব। যদি লাফায় তবু ছাড়ব না।'

এমনি নানা কথা ভাবতে ভাবতে জোলা একটা নদীর ধারে এসে উপস্থিত হল, আর ঠিক তখুনি তার ভয়ানক জলতেষ্টা পেল। জোলা ডাঙার উপর ফুটিটা রেখে জল খেতে গিয়েছে, এর মধ্যে যে কোথা থেকে এক শিয়াল সেখানে এসেছে, তা সে দেখতে পায়নি। তার জল খাওয়া হতে হতে, শিয়ালও ফুটি প্রায় শেষ করে এনেছে। এমন সময় জোলা তাকে দেখতে পেয়ে, 'হায় সর্বনাশ! আমার ঘোড়ার ছানা পালাল।' বলে তাড়া করলে!

শিয়ালকে ছুটে ধরা কি জোলার কাজ! সে শিয়াল তাকে মাঠের উপর দিয়ে, বনের ভিতর দিয়ে, কোথায় নিয়ে গেল তার ঠিকানা নেই। শেষে জোলা আর চলতে পারে না। তখন ঘরে ফিরতে গিয়ে দেখে, পথ হারিয়ে গেছে।

তখন রাত হয়েছে, কাজেই আর ঘরে ফিরবার জো ছিল না। জোলা অনেক খুঁজে এক বুড়ির বাড়িতে গিয়ে, একটু শোবার জায়গা চেয়ে নিলে। বুড়ির দুটি বই ঘর ছিল না। তার একটিতে বুড়ি আর তার নাতনি থাকত। আর একটিতে জিনিসপত্র ছিল, সেইটিতে সে জোলাকে জায়গা দিলে।

একটা বাঘ রোজ রাত্রে বুড়ির ঘরের পিছনে এসে বসে থাকত। বুড়ি তা টের পেয়ে, রাত্রে কখনো ঘরের বাইরে আসত না, তার নাতনিকেও আসতে দিত না। কিন্তু নাতনিটি জোলার কাছে তার ঘোড়ার ডিমের কথা একটু শুনতে পেয়েছিল, তার কথা ভালো করে শুনবার জন্যে সে আবার তার কাছে যেতে চাইল। তখন বুড়ি তাকে বললে, 'না-না, যাস্ নে! বাঘে-টাগে ধরে নেবে!'

'বাঘে-টাগে' এমনি করে লোকে বলে থাকে। টাগ বলে কোনো জন্তু নেই। কিন্তু বাঘ তো আর সে কথা জানে না, সে ঘরের পিছনে বসে টাগের কথা শুনে ভারি ভাবনায় পড়ে গেছে। সে ঠিক বুঝে নিয়েছে যে, টাগ তার নিজের চেয়েও ঢের ভয়ানক একটা জানোয়ার বা রাক্ষস বা ভূত হবে। আর তখন থেকে তার বেজায় ভয় হয়েছে, আর সে ভাবছে, টাগ যদি আসে কোন্‌খান দিয়ে সে পালাবে!

এমন সময় সেই জোলা ভোর হয়েছে কি না দেখবার জন্যে বাইরে এসেছে। এসেই সে বাঘকে দেখতে পেয়ে মনে করলে— 'ওই রে! আমার ঘোড়ার ছানা বসে আছে!'

অমনি সে ছুটে গিয়ে, বাঘের নাকে মুখে গলায় কাপড় জড়িয়ে তড়াক করে তার পিঠে উঠে বসল!

বাঘ যে তখন কী ভয়ানক চমকে গেল কী বলব! সে ভাবল—'হায় হায়! সর্বনাশ হয়েছে! নিশ্চয় আমাকে টাগে ধরেছে!' এই মনে করে বাঘ প্রাণের ভয়ে ছুটতে লাগল। কিন্তু চোখে কাপড় বাঁধা ছিল বলে ভালো করে ছুটতে পারল না।

জোলা তো গোড়া থেকেই তার পিঠে চড়ে বসে আছে, আর ভাবছে এটা তার ঘোড়ার ছানা! সে ঠিক করে রেখেছে যে, একটু ফরসা হলেই পথ চিনতে পারবে, ঘোড়ার ছানাটাকে নিয়ে বাড়ি যাবে। ফরসা যখন হল, তখন জোলা দেখলে যে, কাজ তো হয়েছে! সে ঘোড়া মনে করে বাঘের উপর চড়ে বসেছে! তখন আর সে কী করে? সে ভাবলে যে এবারে আর রক্ষা নেই!

বাঘ ছুটছে আর বলছে, 'দোহাই টাগদাদা! আমার ঘাড় থেকে নামো, আমি তোমায় পুজো করব।' জোলা জানে না যে বাঘ তাকেই টাগ বলছে! জোলা খালি ভাবছে, সে কী করে পালাবে।

এমন সময় বাঘ একটা বটগাছের তলা দিয়ে যাচ্ছিল। সেই গাছের ডালগুলি খুব নিচু, হাত বাড়ালেই ধরা যায়! জোলা খপ করে তার একটা ডাল ধরে ঝুলে গাছে উঠে পড়ল।

তখন জোলাও বললে, 'বড্ড বেঁচে গিয়েছি!'

বাঘও বললে, 'বড্ড বেঁচে গিয়েছি!'

কিন্তু খালি গাছে উঠলে কী হবে? তা থেকে নামতে পারলে তো হয়। সে হতভাগা বাঘটা সেখান থেকে ছুটে না পালিয়ে গাছতলায় বসে হাঁপাতে লাগল, আর চেঁচিয়ে অন্য বাঘদের ডাকতে লাগল। ডাক শুনে চার-পাঁচটা বাঘ সেখানে এসে বললে, 'কী হয়েছে তোমার? তোমার চোখ বাঁধলে কে?'

বাঘ হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'আরে ভাই, আজ আর একটু হলেই গিয়েছিলুম আর কি! আমাকে টাগে ধরেছিল! অনেক হাতজোড় করে পুজো দেব বলতে তবে ছেড়ে দিয়েছে! সেই বেটা আমার চোখ বেঁধে রেখেছে, পুজো না দিলে আবার এসে ধরবে।'

এই কথা শুনে সব বাঘ মিলে, সেই গাছতলায় টাগের পুজো আরম্ভ করল। বড় বড় মোষ আর হরিণ নিয়ে দলে দলে বাঘ আসতে লাগল। জোলা আর অত বাঘ কখনো দেখেনি। সে তো গাছে বসে কেঁপেই অস্থির!

জোলা কাঁপছে আর গাছের পাতা নড়ছে। বাঘেরা তাতে ব্যস্ত হয়ে চেয়ে দেখল, পাতার আড়ালে ছিল বলে জোলাকে চিনতে পারল না।

একজন বললে, 'ভাই, গাছের উপর ওটা কী?'

আর একজন বললে, 'দেখ ভাই, ওটার কী মস্ত লেজ!'

লেজ তো নয়, জোলার কাপড় ঝুলছিল। পাতার জন্যে ভালো করে দেখতে না পেয়ে বাঘেরা তাকেই লেজ মনে করেছে। সেই লেজ দেখে একটা বুড়ো বাঘ বললে, 'ওটা একটা খুব ভয়ানক জানোয়ার হবে, হয়তো-বা টাগই হবে!' এই কথা শুনেই তো সব বাঘ মিলে 'ধরলে! ধরলে! পালা, পালা!' বলে সেখান থেকে ছুটে পালাল। তখন জোলাও গাছ থেকে নেমে বাড়ি গেল।

জোলাকে দেখে তার ছেলে বললে, 'কই বাবা, ঘোড়া কই?'

জোলা তার গালে ঠাস করে এক চড় মেরে বললে, 'এই নে তোর ঘোড়া!' তারপর থেকে সে-ছেলে আর ঘোড়ার কথা বলত না।

টুনটুনি আর নাপিতের কথা

টুনটুনি গিয়েছিল বেগুনপাতায় বসে নাচতে। নাচতে নাচতে খেল বেগুন-কাঁটায় খোঁচা। তাই থেকে তার হল মস্ত বড় ফোঁড়া।

ও মা, কী হবে? এতবড় ফোঁড়া কী করে সারবে?

টুনটুনি একে জিগ্‌গেস করে, তাকে জিগ্‌গেস করে। সবাই বললে, 'ওটা নাপিত দিয়ে কাটিয়ে ফেল।'

তাই টুনটুনি নাপিতের কাছে গিয়ে বললে, 'নাপিতদাদা, নাপিতদাদা, আমার ফোঁড়াটা কেটে দাও না!' নাপিত তার কথা শুনে ঘাড় বেঁকিয়ে নাক সিঁটকিয়ে বললে, 'ঈস্! আমি রাজাকে কামাই, আমি তোর ফোঁড়া কাটতে গেলুম আর কি!'

টুনটুনি বললে, 'আচ্ছা দেখতে পাবে এখন, ফোঁড়া কাটতে যাও কি না।'

বলে সে রাজার কাছে গিয়ে নালিশ করলে, 'রাজামশাই, আপনার নাপিত কেন আমার ফোঁড়া কেটে দিচ্ছে না? ওকে সাজা দিতে হবে!'

শুনে রাজামশাই হো-হো করে হাসলেন, বিছানায় গড়াগড়ি দিলেন, নাপিতকে কিছু বললেন না। তাতে, টুনটুনির ভারি রাগ হল। সে ইঁদুরের কাছে গিয়ে বললে, 'ইঁদুরভাই, ইঁদুরভাই, বাড়ি আছ?'

ইঁদুর বললে, 'কে ভাই? টুনিভাই? এস ভাই! বস ভাই! খাট পেতে দি, ভাত বেড়ে দি, খাবে ভাই?'

টুনটুনি বললে, 'তবে ভাত খাই, যদি এক কাজ কর।'

ইঁদুর বললে, 'কী কাজ?'

টুনটুনি বললে, 'রাজামশাই যখন ঘুমিয়ে থাকবেন, তখন গিয়ে তাঁর ভুঁড়িটা কেটে ফুটো করে দিতে হবে।'

তা শুনে ইঁদুর জিভ কেটে কানে হাত দিয়ে বললে, 'ওরে বাপরে! আমি তা পারব না।' তাতে টুনটুনি রাগ করে বিড়ালের কাছে গিয়ে বললে, 'বিড়ালভাই, বিড়ালভাই, বাড়ি আছ?'

বিড়াল বললে, 'কে ভাই? টুনিভাই? এস ভাই! বস ভাই! খাট পেতে দি, ভাত বেড়ে দি, খাবে ভাই?'

টুনটুনি বললে, 'তবে ভাত খাই, যদি ইঁদুর মার।'

বিড়াল বললে, 'এখন আমি ইঁদুর-টিদুর মারতে যেতে পারব না, আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে।' শুনে টুনটুনি রাগের ভরে লাঠির কাছে গিয়ে বললে, 'লাঠিভাই, লাঠিভাই, বাড়ি আছ?'

লাঠি বললে, 'কে ভাই? টুনিভাই? এস ভাই! বস ভাই! খাট পেতে দি, ভাত বেড়ে দি, খাবে ভাই?'

টুনটুনি বললে, 'তবে ভাত খাই, যদি বিড়ালকে ঠেঙাও।'

লাঠি বললে, 'বিড়াল আমার কী করেছে যে আমি তাকে ঠেঙাতে যাব? আমি তা পারব না।' তখন টুনটুনি আগুনের কাছে গিয়ে বললে, 'আগুনভাই, আগুনভাই, বাড়ি আছ?'

আগুন বললে, 'কে ভাই? টুনিভাই? এস ভাই! বস ভাই! খাট পেতে দি, ভাত বেড়ে দি, খাবে ভাই?'

টুনটুনি বললে, 'তবে ভাত খাই, যদি তুমি লাঠি পোড়াও।'

আগুন বললে, 'আজ ঢের জিনিস পুড়িয়েছি, আজ আর কিছু পোড়াতে পারব না।' তাতে টুনটুনি তাকে খুব করে বকে, সাগরের কাছে গিয়ে বললে, 'সাগরভাই, সাগরভাই, বাড়ি আছ?'

সাগর বললে, 'কে ভাই? টুনিভাই? এস ভাই! বস ভাই! খাট পেতে দি, ভাত বেড়ে দি, খাবে ভাই?'

টুনটুনি বললে, 'তবে ভাত খাই, যদি তুমি আগুন নিভাও।'

সাগর বললে, 'আমি তা পারব না।' তখন টুনটুনি হাতির কাছে গিয়ে বললে, 'হাতিভাই, হাতিভাই, বাড়ি আছ?'

হাতি বললে, 'কে ভাই? টুনিভাই? এস ভাই! বস ভাই! খাট পেতে দি, ভাত বেড়ে দি, খাবে ভাই?'

টুনটুনি বললে, 'তবে ভাত খাই, যদি সাগরের জল সব খেয়ে ফেল।'

হাতি বললে, 'অত জল খেতে পারব না, আমার পেট ফেটে যাবে।'

কেউ তার কথা শুনল না দেখে টুনটুনি শেষে মশার কাছে গেল। মশা দূর থেকে তাকে দেখেই বললে, 'কে ভাই? টুনিভাই? এস ভাই! বস ভাই! খাট পেতে দি, ভাত বেড়ে দি, খাবে ভাই?'

টুনটুনি বললে, 'তবে ভাত খাই, যদি হাতিকে কামড়াও।'

মশা বললে, 'সে আবার একটা কথা! এখুনি যাচ্ছি! দেখব হাতি বেটার কত শক্ত চামড়া!' বলে, সে সকল দেশের সকল মশাকে ডেকে বললে, 'তোরা আয় তো রে ভাই, দেখি হাতি বেটার কত শক্ত চামড়া।' অমনি পীন্-পীন্-পীন্-পীন্ করে যত রাজ্যের মশা, বাপ বেটা ভাই বন্ধু মিলে হাতিকে কামড়াতে চলল। মশায় আকাশ ছেয়ে গেল, সূর্য ঢেকে গেল। তাদের পাখার হাওয়ায় ঝড় বইতে লাগল। পীন্-পীন্-পীন্-পীন্ ভয়ানক শব্দ শুনে সকলের প্রাণ কেঁপে উঠল। তখন—

হাতি বলে, সাগর শুষি।
সাগর বলে, আগুন নেভাই!
আগুন বলে, লাঠি পোড়াই!
লাঠি বলে, বিড়াল ঠেঙাই!
বিড়াল বলে, ইঁদুর মারি।
ইঁদুর বলে, রাজার ভুঁড়ি কাটি!
রাজা বলে, নাপতে বেটার মাথা কাটি!

নাপিত হাতজোড় করে কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'রক্ষে কর, টুনিদাদা! এস তোমার ফোঁড়া কাটি।'

তারপর টুনটুনির ফোঁড়া সেরে গেল, আর সে ভারি খুশি হয়ে আবার গিয়ে নাচতে আর গাইতে লাগল—টুনটুনা টুন্ টুন্ টুন্! ধেই ধেই!

নরহরি দাস

যেখানে মাঠের পাশে বন আছে, আর বনের ধারে মস্ত পাহাড় আছে, সেইখানে, একটা গর্তের ভিতরে একটি ছাগলছানা থাকত। সে তখনো বড় হয়নি, তাই গর্তের বাইরে যেতে পেত না। বাইরে যেতে চাইলেই তার মা বলত, 'যাসনে! ভালুকে ধরবে, বাঘে নিয়ে যাবে, সিংহ খেয়ে ফেলবে!' তা শুনে তার ভয় হত, আর সে চুপ করে গর্তের ভিতরে বসে থাকত। তারপর সে একটু বড় হল, তার ভয়ও কমে গেল। তখন তার মা বাইরে চলে গেলেই সে গর্তের ভিতর থেকে উঁকি মেরে দেখত। শেষে একদিন একেবারে গর্তের বাইরে চলে এল।

সেইখানে এক মস্ত ষাঁড় ঘাস খাচ্ছিল। ছাগলছানা আর এতবড় জন্তু কখনো দেখেনি। কিন্তু তার শিং দেখেই সে মনে করে নিল, ওটাও ছাগল, খুব ভালো জিনিস খেয়ে এতবড় হয়েছে। তাই সে ষাঁড়ের কাছে গিয়ে জিগ্‌গেস করল, 'হ্যাঁগা, তুমি কী খাও?'

ষাঁড় বললে, 'আমি ঘাস খাই।'

ছাগলছানা বললে, 'ঘাস তো আমার মা-ও খায়, সে তো তোমার মতো এতবড় হয়নি।'

ষাঁড় বললে, 'আমি তোমার মায়ের চেয়ে ঢের ঢের ভালো ঘাস অনেক বেশি করে খাই।'

ছাগলছানা বললে, 'সে ঘাস কোথায়?'

ষাঁড় বললে, 'ওই বনের ভিতরে।'

ছাগলছানা বললে, 'আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে হবে।' এ-কথা শুনে ষাঁড় তাকে নিয়ে গেল।

সেই বনের ভিতরে খুব চমৎকার ঘাস ছিল। ছাগলছানার পেটে যত ঘাস ধরল, সে তত ঘাস খেল।

খেয়ে তার পেট এমন ভারি হল যে, সে আর চলতে পারে না।

সন্ধে হলে ষাঁড় এসে বললে, 'এখন চল বাড়ি যাই।'

কিন্তু ছাগলছানা কী করে বাড়ি যাবে? সে চলতেই পারে না।

তাই সে বললে, 'তুমি যাও, আমি কাল যাব।'

তখন ষাঁড় চলে গেল। ছাগলছানা একটি গর্ত দেখতে পেয়ে তার ভিতরে ঢুকে রইল।

সেই গর্তটা ছিল এক শিয়ালের। সে তার মামা বাঘের বাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিল। অনেক রাত্রে ফিরে এসে দেখে, তার গর্তের ভিতর কীরকম একটা জন্তু ঢুকে রয়েছে। ছাগলছানাটা কালো ছিল, তাই শিয়াল অন্ধকারের ভিতর ভালো করে দেখতে পেল না। সে ভাবল বুঝি রাক্ষস-টাক্ষস হবে। এই মনে করে সে ভয়ে ভয়ে জিগ্‌গেস করল, 'গর্তের ভিতর কে ও?'

ছাগলছানাটা ভারি বুদ্ধিমান ছিল, সে বললে—

লম্বা লম্বা দাড়ি
ঘন ঘন নাড়ি।
সিংহের মামা আমি নরহরি দাস
পঞ্চাশ বাঘে মোর এক-এক গ্রাস!

শুনেই তো শিয়াল 'বাবা গো!' বলে সেখান থেকে দে ছুট! এমন ছুট দিল যে একেবারে বাঘের ওখানে গিয়ে তবে সে নিশ্বাস ফেললে।

বাঘ তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে জিগ্‌গেস করলে, 'কি ভাগ্নে, এই গেলে, আবার এখুনি এত ব্যস্ত হয়ে ফিরলে যে?'

শিয়াল হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'মামা, সর্বনাশ তো হয়েছে, আমার গর্তে এক নরহরি দাস এসেছে। সে বলে কিনা যে পঞ্চাশ বাঘে তার এক গ্রাস!'

তা শুনে বাঘ ভয়ানক রেগে বললে, 'বটে, তার এতবড় আস্পর্ধা! চল তো ভাগ্নে! তাকে দেখাব কেমন পঞ্চাশ বাঘে তার এক গ্রাস!'

শিয়াল বললে, 'আমি আর সেখানে যেতে পারব না, আমি সেখানে গেলে যদি সেটা হাঁ করে আমাদের খেতে আসে, তা হলে তুমি তো দুই লাফেই পালাবে। আমি তো তেমন ছুটতে পারব না, আর সে বেটা আমাকেই ধরে খাবে।'

বাঘ বললে, 'তা-ও কি হয়? আমি কখনো তোমাকে ফেলে পালাব না।'

শিয়াল বললে, 'তবে আমাকে তোমার লেজের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে চল।'

তখন বাঘ তো শিয়ালকে বেশ করে লেজের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছে, আর শিয়াল ভাবছে, এবারে আর বাঘমামা আমাকে ফেলে পালাতে পারবে না।

এমনি করে তারা দুজনে শিয়ালের গর্তের কাছে এল। ছাগলছানা দূর থেকেই তাদের দেখতে পেয়ে শিয়ালকে বললে—

দূর হতভাগা! তোকে দিলুম দশ বাঘের কড়ি,
এক বাঘ নিয়ে এলি লেজে দিয়ে দড়ি!

শুনেই তো ভয়ে বাঘের প্রাণ উড়ে গিয়েছে। সে ভাবলে যে, নিশ্চয় শিয়াল তাকে ফাঁকি দিয়ে নরহরি দাসকে খেতে দেবার জন্য এনেছে। তারপর সে কি আর সেখানে

দাঁড়ায়! সে পঁচিশ হাত লম্বা এক-এক লাফ দিয়ে শিয়ালকে সুদ্ধ নিয়ে পালাল। শিয়াল বেচারা মাটিতে আছাড় খেয়ে, কাঁটার আঁচড় খেয়ে, খেতের আলে ঠোক্কর খেয়ে একেবারে যায় আর কি! শিয়াল চেঁচিয়ে বললে, 'মামা, আল! মামা, আল!' তা শুনে বাঘ ভাবে বুঝি সেই নরহরি দাস এল, তাই সে আরো বেশি করে ছোটে। এমনি করে সারারাত ছুটোছুটি করে সারা হল।

সকালে ছাগলছানা বাড়ি ফিরে এল।

শিয়ালের সেদিন ভারি সাজা হয়েছিল। সেই থেকে বাঘের উপর তার এমনি রাগ হল যে, সে রাগ আর কিছুতেই গেল না।

জোলা আর সাত ভূত

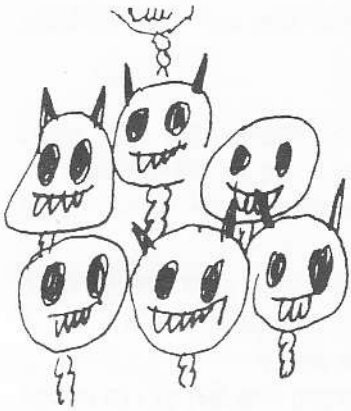

এক জোলা ছিল, সে পিঠে খেতে বড় ভালোবাসত।

একদিন সে তার মাকে বলল, 'মা, আমার বড্ড পিঠে খেতে ইচ্ছে করছে, আমাকে পিঠে করে দাও।'

সেইদিন তার মা তাকে লাল-লাল, গোল-গোল, চ্যাপটা-চ্যাপটা সাতখানি চমৎকার পিঠে করে দিল। জোলা সেই পিঠে পেয়ে ভারি খুশি হয়ে নাচতে লাগল আর বলতে লাগল,

'একটা খাব, দুটো খাব,
সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব !'

জোলার মা বলল, 'খালি নাচবিই যদি, তবে খাবি কখন?'

জোলা বলল, 'খাব কি এখানে? সবাই যেখানে দেখতে পাবে, সেখানে গিয়ে খাব।' বলে জোলা পিঠেগুলি নিয়ে নাচতে নাচতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, আর বলতে লাগল,

'একটা খাব, দুটো খাব,
সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব !'

নাচতে নাচতে জোলা একেবারে সেই বটগাছতলায় চলে এল, যেখানে হাট হয়। সেই গাছের তলায় এসে সে খালি নাচছে আর বলছে,

'একটা খাব, দুটো খাব,
সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব !'

এখন হয়েছে কি—সেই গাছে সাতটা ভূত থাকত। জোলা 'সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব' বলছে, আর তা শুনে তাদের তো বড্ডই ভয় লেগেছে। তারা সাতজনে গুটিশুটি হয়ে কাঁপছে, আর বলছে, 'ওরে সর্বনাশ হয়েছে! ওই দেখ, কোত্থেকে এক বিটকেলে ব্যাটা এসেছে, আর বলছে আমাদের সাতজনকেই চিবিয়ে খাবে! এখন কী করি বল্ তো!'

অনেক ভেবে তারা একটা হাঁড়ি নিয়ে জোলার কাছে এল। এসে জোড়হাত করে তাকে বলল, 'দোহাই কর্তা! আমাদের চিবিয়ে খাবেন না। আপনাকে এই হাঁড়িটি দিচ্ছি, এইটি নিয়ে আমাদের ছেড়ে দিন!'

সাতটা মিশমিশে কালো তালগাছপানা ভূত, তাদের কুলোর মতো কান, মুলোর মতো দাঁত, চুলোর মতো চোখ—তারা জোলার সামনে এসে কাঁইমাই করে কথা বলছে দেখেই তো সে এমনি চমকে গেল যে, সেখান থেকে ছুটে পালাবার কথা তার মনেই এল না। সে বলল, 'হাঁড়ি নিয়ে আমি কী করব!'

ভূতেরা বলল, 'আজ্ঞে, আপনার যখন যা খেতে ইচ্ছে হবে, তাই এই হাঁড়ির ভিতর পাবেন।'

জোলা বলল, 'বটে! আচ্ছা আমি পায়েস খাব।'

বলতে বলতেই সেই হাঁড়ির ভিতর থেকে চমৎকার পায়েশের গন্ধ বেরুতে লাগল। তেমন পায়েশ জোলা আর কখনো খায় নি, তার মা-ও খায় নি, তার বাপও খায় নি। কাজেই জোলা যারপরনাই খুশি হয়ে হাঁড়ি নিয়ে সেখান থেকে চলে এল আর ভূতেরা ভাবল, 'বাবা! বড্ড বেঁচে গিয়েছি!'

তখন বেলা অনেক হয়েছে, আর জোলার বাড়ি সেখান থেকে ঢের দূরে। তাই জোলা ভাবল, 'এখন এই রোদে কী করে বাড়ি যাব? বন্ধুর বাড়ি কাছে আছে, এ বেলা সেইখানেই যাই; তারপর বিকেলে বাড়ি যাব এখন।'

বলে সে তো তার বন্ধুর বাড়ি এসেছে। সে হতভাগা কিন্তু ছিল দুষ্টু। সে জোলার হাঁড়িটি দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'হাঁড়ি কোত্থেকে আনলি রে?'

জোলা বলল, 'বন্ধু, এ যে-সে হাঁড়ি নয়, এর ভারি গুণ।'

বন্ধু বলল, 'বটে? আচ্ছা দেখি তো কেমন গুণ।'

জোলা বলল, 'তুমি যা খেতে চাও, তাই আমি এর ভিতর থেকে বার করে দিতে পারি।'

বন্ধু বলল, 'আমি রাবড়ি, সন্দেশ, রসগোল্লা, সরভাজা, মালপোয়া, পান্তুয়া, কাঁচাগোল্লা, ক্ষীরমোহন, গজা, মতিচুর, জিলিপি, অমৃতি, বরফি, চমচম এইসব খাব।'

জোলার বন্ধু যা বলছে, জোলা হাঁড়ির ভিতর হাত দিয়ে তাই বার করে আনছে। এ-সব দেখে বন্ধু ভাবল যে, এ জিনিসটি চুরি না করলে হচ্ছে না।

তখন সে জোলাকে কতই আদর করতে লাগল। পাখা এনে তাকে হাওয়া করল, গামছা দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিল, আর বলল, 'আহা ভাই, তোমার কী কষ্টই হয়েছে! গা দিয়ে ঘাম বেয়ে পড়েছে! একটু ঘুমোবে ভাই? বিছানা করে দেব?'

সত্যি সত্যিই জোলার তখন ঘুম পেয়েছিল; কাজেই সে বলল, 'আচ্ছা বিছানা করে দাও।'

তখন তার বন্ধু বিছানা করে তাকে ঘুম পাড়িয়ে, তার হাঁড়িটি বদলে তার জায়গায় ঠিক তেমনি ধরনের আর-একটা হাঁড়ি রেখে দিল। জোলা তার কিছুই জানে না, সে বিকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়ি চলে এসেছে আর তার মাকে বলছে, 'দেখো মা, কী চমৎকার একটা হাঁড়ি এনেছি। তুমি কী খাবে মা? সন্দেশ খাবে? পিঠে খাবে? দেখো আমি এর ভিতর থেকে সে-সব বার করে দিচ্ছি।'

কিন্তু এ তো আর সে হাঁড়ি নয়, এর ভিতর থেকে সে-সব জিনিস বেরুবে কেন? মাঝখান থেকে জোলা বোকা বনে গেল, তার মা তাকে বকতে লাগল।

তখন তো জোলার বড্ড রাগ হয়েছে, আর সে ভাবছে 'সেই ভূত ব্যাটাদেরই এ কাজ।' তার বন্ধু যে তাকে ঠকিয়েছে, এ কথা তার মনেই হল না।

কাজেই পরদিন সে আবার সেই বটগাছতলায় গিয়ে বলতে লাগল,

'একটা খাব, দুটো খাব,
সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব!'

তা শুনে আবার ভূতগুলো কাঁপতে কাঁপতে একটা ছাগল নিয়ে এসে তাকে হাতজোড় করে বলল, 'মশাই গো! আপনার পায়ে পড়ি, এই ছাগলটা নিয়ে যান। আমাদের ধরে খাবেন না।'

জোলা বলল, 'ছাগলের কী গুণ?'

ভূতরা বলল, 'ওকে সুড়সুড়ি দিলে ও হাসে, আর ওর মুখ দিয়ে খালি মোহর পড়ে।'

অমনি জোলা ছাগলের গায়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগল। আর ছাগলটাও 'হিহি হিহি' করে হাসতে লাগল, আর মুখ দিয়ে ঝর ঝর করে খালি মোহর পড়তে লাগল। তা দেখে জোলার মুখে তো আর হাসি ধরে না। সে ছাগল নিয়ে ভাবল যে, এ জিনিসটি বন্ধুকে না-দেখালেই নয়।

সেদিন তার বন্ধু তাকে আরো ভালো বিছানা করে দিয়ে দুহাতে দুই পাখা নিয়ে হাওয়া করল। জোলার ঘুমও হল তেমনি। সেদিন আর সন্ধ্যার আগে তার ঘুম ভাঙল না। তার বন্ধু তো এর মধ্যে কখন তার ছাগল চুরি করে তার জায়গায় আর-একটা ছাগল রেখে দিয়েছে।

সন্ধ্যার পর জোলা তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে তার বন্ধুর সেই ছাগলটা নিয়ে বাড়ি এল; এসে দেখল যে, তার মা তার দেরি দেখে ভারি চটে আছে। তা দেখে সে বলল, 'রাগ আর করতে হবে না, মা, আমার ছাগলের গুণ দেখলে খুশি হয়ে নাচবে!' বলেই সে ছাগলের বগলে আঙুল দিয়ে বলল, 'কাতু কুতু কুতু কুতু কুতু!!!'

ছাগল কিন্তু তাতে হাসল না, তার মুখ দিয়ে মোহরও বেরুল না। জোলা আবার তাকে সুড়সুড়ি দিয়ে বলল, 'কাতু কুতু কুতু কুতু কুতু কুতু কুতু কুতু!!'

তখন ছাগল রেগে গিয়ে শিং বাগিয়ে তার নাকে এমনি বিষম গুঁতো মারল যে সে চিৎ হয়ে পড়ে চেঁচাতে লাগল। আর তার নাক দিয়ে রক্তও পড়ল প্রায় আধ সের তিন পোয়া। তার ওপর আবার তার মা তাকে এমন বকুনি দিল যে, তেমন বকুনি সে আর খায় নি।

তাতে জোলার রাগ যে হল, সে আর কী বলব! সে আবার সেই বটগাছতলায় গিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল,

'একটা খাব, দুটো খাব,
সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব!'

বেটারা আমাকে দু-দুবার ফাঁকি দিয়েছিস, ছাগল দিয়ে আমার নাক থেঁতলা করে দিয়েছিস—আজ আর তোদের ছাড়ছি নে!'

ভূতেরা তাতে ভারি আশ্চর্য হয়ে বলল, 'সে কি মশাই, আমরা কী করে আপনাকে ফাঁকি দিলুম, আর ছাগল দিয়েই-বা কী করে আপনার নাক থেঁতলা করলুম?'

জোলা তার নাক দেখিয়ে বলল, 'এই দেখ না, গুঁতো মেরে সে আমার কী দশা করেছে। তোদের সব কটাকে চিবিয়ে খাব!'

ভূতেরা বলল, 'সে কখনো আমাদের ছাগল নয়। আপনি কি এখান থেকে সোজাসুজি বাড়ি গিয়েছিলেন?'

জোলা বলল, 'না, আগে বন্ধুর ওখানে গিয়েছিলুম। সেখানে খানিক ঘুমিয়ে তারপর বাড়ি গিয়েছিলুম।'

ভূতেরা বলল, 'তবেই তো হয়েছে! আপনি যখন ঘুমোচ্ছিলেন, সেই সময় আপনার বন্ধু আপনার ছাগল চুরি করেছে।' এ-কথা শুনেই জোলা সব বুঝতে পারল। সে বলল, 'ঠিক ঠিক। সে বেটাই আমার হাঁড়িও চুরি করেছে, ছাগলও চুরি করেছে। এখন কী হবে?'

ভূতেরা তাকে একগাছি লাঠি দিয়ে বলল, 'এই লাঠি আপনার হাঁড়িও এনে দেবে, ছাগলও এনে দেবে! ওকে শুধু একটিবার আপনার বন্ধুর কাছে নিয়ে বলবেন, 'লাঠি লাগ তো!' তা হলে দেখবেন কী মজা হবে! লাখ লোক ছুটে এলেও এ লাঠির সঙ্গে পারবে না, লাঠি তাদের সকলকে পিটে ঠিক করে দেবে।'

জোলা তখন সেই লাঠিটি বগলে করে তার বন্ধুকে গিয়ে বলল, 'বন্ধু, একটা মজা দেখবে?'

বন্ধু তো ভেবেছে না-জানি কী মজা হবে। তারপর যখন জোলা বলল, 'লাঠি, লাগ তো!' তখন সে এমনি মজা দেখল, যেমন তার জন্মে আর কখনো দেখেনি। লাঠি তাকে পিটে পিটে তার মাথা থেকে পা অবধি চামড়া তুলে ফেলল। সে ছুটে পালাল, লাঠি তার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে তাকে পিটতে পিটতে ফিরিয়ে নিয়ে এল। তখন সে কাঁদতে কাঁদতে হাতজোড় করে বলল, 'তোর পায়ে পড়ি ভাই, তোর হাঁড়ি নে, তোর ছাগল নে, আমাকে ছেড়ে দে!'

জোলা বলল, 'আগে ছাগল আর হাঁড়ি আন্, তবে তোকে ছাড়ব।'

কাজেই বন্ধুমশাই আর কী করেন? সেই পিটুনি খেতে-খেতেই হাঁড়ি আর ছাগল এনে হাজির করলেন। জোলা হাঁড়ি হাতে নিয়ে বলল, 'সন্দেশ আসুক তো!' অমনি হাঁড়ি সন্দেশে ভরে গেল। ছাগলকে সুড়সুড়ি দিতে-না-দিতেই সে হো হো করে হেসে ফেলল, আর তার মুখ দিয়ে চারশোটা মোহর বেরিয়ে পড়ল। তখন সে তার লাঠি, হাঁড়ি আর ছাগল নিয়ে বাড়ি চলে গেল।

এখন আর জোলা গরিব নেই, সে বড়মানুষ হয়ে গেছে। তার বাড়ি, তার গাড়ি, হাতি-ঘোড়া, খাওয়া-পরা, চাল-চলন, লোকজন, সব রাজার মতোন।

দেশের রাজা তাকে যারপরনাই খাতির করেন, তাকে জিজ্ঞাসা না করে কোনো ভারি কাজে হাত দেন না।

এর মধ্যে একদিন হয়েছে কি, আর কোন্ দেশের এক রাজা হাজার হাজার লোকজন নিয়ে এসে সেই দেশ লুটতে লাগল। রাজার সিপাইদের মেরে খোঁড়া করে দিয়েছে, এখন রাজার বাড়ি লুটে কখন তাঁকে ধরে নিয়ে যাবে, তার ঠিক নেই।

রাজামশাই তাড়াতাড়ি জোলাকে ডাকিয়ে বললেন, 'ভাই, এখন কী করি বল্‌তো? বেঁধেই ও নেবে দেখছি।'

জোলা বলল, 'আপনার কোনো ভয় নেই। আপনি চুপ করে ঘরে বসে থাকুন, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।'

বলেই সে তার লাঠিটা বগলে করে রাজার সিংহদরজার বাইরে গিয়ে চুপ করে বসে রইল। বিদেশি রাজা লুটতে লুটতে সেই দিকেই আসছে, তার সিপাই আর হাতি-ঘোড়ার গোলমালে কানে তালা লাগছে, ধুলোয় আকাশ ছেয়ে গিয়েছে। জোলা খালি চেয়ে দেখছে, কিছু বলে না।

বিদেশি রাজা পাহাড়ের মতোন এক হাতি চড়ে সকলের আগে-আগে আসছে, আর ভাবছে, সব লুটে নেবে। আর, জোলা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে আর ভাবছে, আর একটু কাছে এলেই হয়।

তারপর তারা যেই কাছে এসেছে, অমনি জোলা তার লাঠিকে বলল, 'লাঠি, লাগ্ তো।' আর যাবে কোথায়? তখনি এক লাঠি লাখ লাখ হয়ে রাজা আর তার হাতি-ঘোড়া সকলের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। আর পিটুনি যে কেমন দিল, সে যারা সেই পিটুনি খেয়েছিল তারাই বলতে পারে।

পিটুনি খেয়ে রাজা চেঁচাতে চেঁচাতে বলল, 'আর না বাবা, আমাদের ঘাট হয়েছে, এখন ছেড়ে দাও, আমরা দেশে চলে যাই।'

জোলা কিছু বলে না, খালি চুপ করে চেয়ে দেখছে আর একটু একটু হাসছে।

শেষে রাজা বলল, 'তোমাদের যা লুটেছি সব ফিরিয়ে দিচ্ছি, আমার রাজ্য দিচ্ছি, দোহাই বাবা, ছেড়ে দাও।'

তখন জোলা গিয়ে তার রাজাকে বলল, 'রাজামশাই, সব ফিরিয়ে দেবে বলছে আর তাদের রাজ্যও আপনাকে দেবে বলছে, আর বলছে দোহাই বাবা ছেড়ে দাও। এখন কী হুকুম হয়?'

রাজামশায়ের কথায় জোলা তার লাঠি থামিয়ে দিলে। তারপর বিদেশি রাজা কাঁদতে কাঁদতে এসে রাজামশাইয়ের পায়ে পড়ে মাফ চাইল।

রাজামশাই জোলাকে দেখিয়ে বললেন, 'আমার এই লোকটিকে যদি তোমার অর্ধেক রাজ্য দাও, আর তার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দাও, তা হলে তোমাকে মাফ করব।'

সে তো তার সব রাজ্যই দিতে চেয়েছিল। কাজেই জোলাকে তার অর্ধেক রাজ্য আর মেয়ে দিতে তখনি রাজি হল।

তারপর জোলা সেই অর্ধেক রাজ্যের রাজা হল, আর রাজার মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হল। আর ভোজের কি যেমন-তেমন ঘটা হল! সে ভোজ খেয়ে যদি তারা শেষ করতে না-পেরে থাকে, তবে হয়তো এখনো খাচ্ছে। সেখানে একবার যেতে পারলে হত।

দুঃখীরাম

দুঃখীরাম খুব গরিবের ছেলে ছিল। সকলে তাহাকে দুঃখীরাম বলিয়া ডাকিত, কিন্তু তাহার এর চাইতে ঢের ভালো একটা নাম ছিল—সেটা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। দুঃখীরামের যখন সবে দুই বছর বয়স, তখন তাহার মা-বাপ মরিয়া গেল। পৃথিবীতে তাহার আপনার বলিতে আর কেহই ছিল না, খালি ছিল মামা কেষ্ট। দুবছরের ছেলে দুঃখীরাম তাহার মামার খবর কিছুই জানিত না, তাহার মামাও তাহার কোনো খবরই লইল না। কাজেই পাড়ার লোকেরা দয়া করিয়া তাহাকে মানুষ করিতে লাগিল। তখন হইতেই লোকে তাহাকে দুঃখীরাম বলিয়া ডাকিত।

গরিবের ছেলের দুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাওয়াই অনেক সময় মুশকিল হয়, এর উপর আবার কে তাহাকে লেখাপড়া শিখাইবে? অন্য ছেলেদের ফেলিয়া-দেওয়া ছেঁড়া বই পড়িয়া আর পাড়ার লোকের খুঁটিনাটি কাজ করিয়া তাহার দিন যাইতে লাগিল। ইহার মধ্যে একদিন দুঃখীরাম শুনিল যে কেষ্ট বলিয়া তাহার একজন মামা আছে। শুনিয়াই সে মনে করিল যে, একবার মামার বাড়ি যাইতে হইবে।

অনেক সন্ধান করিয়া শেষে সে কেষ্টর বাড়ি বাহির করিল। কেষ্ট তাহাকে দেখিয়াই বলিল, 'তাই তো, দুঃখীরাম এসেছ! এখানে কত কষ্ট পাবে তা তো জানো না। আমরা যে দু মাসে একদিন খাই! কাল খেয়েছি, আবার দু মাস পরে খাব।'

দুঃখীরাম বলিল, 'মামা, তার জন্য ভাবনা কী? তোমরা যখন খাবে আমিও তখনই খাব।' কেষ্ট আর কিছুই বলিল না; দুঃখীরামও আর কিছু বলিল না। মামার বাড়িতে খালি মামা আর মামাত ভাই হরি ছাড়া আর কেহ নাই। মামাত ভাইকে সে দাদা বলিয়া ডাকিতে লাগিল।

সারাদিন কেষ্ট আর হরি কেহই কিছু খাইল না। কাজেই দুঃখীরামেরও খাওয়া জুটিল না। দুঃখীরাম এর চাইতে অনেক বেশি সময় না-খাইয়া কাটাইয়াছে, সুতরাং তাহার বড় একটা ক্লেশও হইল না। সন্ধ্যার সময় সে কেষ্টকে বলিল, 'মামা, আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে, আমি ঘুমোই।' ইহাতে কেষ্ট যেন ভারি খুশি হইল, আর তখনই তাহাকে একটা মাদুর বিছাইয়া দিল। দুঃখীরাম সেই মাদুরে চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

খানিক পরে কেষ্ট আর হরি আসিয়া তাহার পাশেই ঘুমাইতে লাগিল। আসল কথা, কেহই ঘুমোয় নাই—মামা খালি ভাবিতেছে, কতক্ষণে দুঃখীরাম ঘুমাইবে, আর দুঃখীরাম ভাবিতেছে, এরপর মামা কী করে?

দেখিতে দেখিতে হরির নাক ডাকিল। দুঃখীরাম বুঝিল দাদা ঘুমাইয়াছে, এর একটু পরে দুঃখীরাম পাশে একটা খচমচ শব্দ শুনিয়া বুঝিতে পারিল যে, এবারে মামা উঠিয়াছে। তারপর হেঁশেলে হাঁড়ি নাড়ার শব্দ হইল। তারপর হাঁড়ি ধোয়ার খলখল শব্দ, উনান ধরাইবার ফুঁ—সকলই শোনা গেল। দুঃখীরামের আর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। তখন সে চুপি চুপি উঠিয়া রান্নাঘরের বেড়ার ফুটা দিয়া দেখিল, কেষ্ট পায়েশ রাঁধিতেছে।

দুঃখীরাম এক-একবার উঠিয়া দেখে, আবার আসিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকে। যখন দেখিল যে, পায়েশ প্রস্তুত হইয়াছে, তখন হাউমাউ করিয়া উঠিয়া বসিল। গোলমাল শুনিয়া কেষ্ট তাড়াতাড়ি রান্নাঘর হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি রে দুঃখীরাম, কী হইয়াছে?'

দুঃখীরাম বলিল, 'মামা, ও ঘরে তুমি কী করছিলে, আর একজন লোক বেড়ার ফুটো দিয়ে উঁকি মারছিল।' দুঃখীরাম নিজের কথাই বলিয়াছে, কিন্তু কেষ্ট মনে করিল বুঝি চোর আসিয়াছে। তাই সে লাঠি হাতে ঘরের পেছনে বনের ভিতরে চোর তাড়াইতে ছুটিল।

তখন দুঃখীরাম তাহার দাদাকে ঠেলিয়া তুলিয়া বলিল, 'দাদা শিগ্‌গির ওঠো, মামা একটা লাঠি হাতে কোথায় যেন বেরিয়ে গেলেন।'

হরি বেচারার মনে ভারি ভয় হইল। সে মনে করিল যে লাঠি হাতে যখন গিয়াছে তখন নিশ্চয়ই একটু দূরে কোথায়ও গিয়াছে। তিন মাইল দূরে হরির ভগ্নীর বাড়ি, হয়তো হঠাৎ তাহার কোনো ব্যারাম হইয়াছে, আর বাবা খবর পাইয়া তাহাকে দেখিতে গিয়াছে। এইরূপ ভাবিয়া হরি ব্যস্ত হইয়া তাহার ভগ্নীর বাড়ি চলিল। খানিক পরে কেষ্ট ফিরিয়া আসিল। সে চোরকে ধরিতে পারে নাই, লাভের মধ্যে বিছুটি লাগিয়া তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গিয়াছে। সে আসিয়া হরিকে দেখিতে না পাইয়া দুঃখীরামকে জিজ্ঞাসা করিল, 'হরি কোথায় রে?'

দুঃখীরাম বলিল,'মামা, তুমিও গেলে আর যে-লোকটা তোমার ঘরে উঁকি মারছিল, সেই লোকটা দাদাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে তার সঙ্গে কথা কইল; আর দাদাও তখ্‌খুনি বেরিয়ে গেল।'

ইহা শুনিয়া কেষ্ট মনে করিল যে হরি নিশ্চয় পাড়ায় দুষ্ট ছেলের সঙ্গে জুটিয়া তাস খেলিতে গিয়াছে। সুতরাং হরি এবং সেই পাড়ার দুষ্ট ছেলেটার উপর তাহার ভয়ানক রাগ হইল, আর সেই লাঠি হাতে করিয়াই সে তাহার সঙ্গীকে শাস্তি দিবার জন্য পাড়া খুঁজিতে বাহির হইল।

দুঃখীরাম যখন দেখিল যে, ওর মামা আর দাদার বাড়ি ফিরিতে একটু বিলম্ব হইবে, তখন সে আস্তে আস্তে রান্নাঘরে গিয়া পায়েশের হাঁড়ি নামাইল। একে দুঃখীরামের বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছিল, তার উপর আবার তার মামা রাঁধে বড় সরেস। সুতরাং দেখিতে

দেখিতে সেই পায়েশের হাঁড়ি খালি হইয়া গেল। তারপর দুঃখীরাম আবার সেই মাদুরে শুইয়া আরামে নিদ্রা গেল।

হরি ভগ্নীর বাড়িতে গিয়া তাহাকে ভালোই দেখিতে পাইল। কিন্তু সে রাত্রে তাহার বোন আর তাহাকে বাড়ি ফিরিয়া আসিতে দিল না। এদিকে কেষ্ট তাহাকে আকাশ-পাতাল করিয়া খুঁজিয়াছে, এবং তাহাকে কোথায়ও দেখিতে না পাইয়া রাগে আর বিছুটির জ্বালায় ছটফট করিতেছে। সুতরাং ভোরবেলা হরি যেই বাড়ি ফিরিয়া আসিল, অমনি কেষ্ট সেই লাঠি দিয়া তাহাকে খুব কয়েক ঘা লাগাইল।

এইরূপে সমস্ত রাত্রি নাকাল হইয়া, শেষে রান্নাঘরে গিয়া সে দেখে—পায়েশের হাঁড়ি খালি! তখন আর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। দুঃখীরাম সকালে উঠিয়া অবধি কেমন আড়চোখে চায়, আর একটু হাসে। সুতরাং তাহা যে দুঃখীরামেরই কাজ, ইহা বেশ বুঝা গেল।

পরদিন বাপ-বেটায় মিলিয়া রাজার নিকট নালিশ করিতে গেল। রাজা দুঃখীরামকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হ্যাঁরে তুই এমন কাজ কেন করলি? ওদের পায়েশ চুরি করে কেন খেলি? —আর মিছে কথা বলে কেন ওদের নাকাল করলি?'

দুঃখীরাম হাতজোড় করিয়া বলিল, 'দোহাই ধর্মাবতার! ওঁরা দুমাসে একদিন খান। পরশু খেয়েছিলেন, আবার কাল পায়েশ রাঁধলেন কেন? ওঁরাই বলুন। তারপর নাকাল করার কথা বলছেন? তা আমি তো সত্যিকথাই বলেছি, তাতে যদি ওরা খামকা নাকাল হতে গেলেন, তা আমার কী দোষ।'

রাজা আগাগোড়া সমস্ত শুনিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। মোকদ্দমা ডিশমিশ হইয়া গেল।

দুঃখীরামকে বেশ চালাক-চতুর দেখিয়া রাজা তাহাকে একটি চাকরি দিলেন। দুঃখীরাম এত ভালো করিয়া কাজ করিতে লাগিল যে, কয়েক বৎসরের ভিতরেই সেই সামান্য চাকরি হইতে ক্রমে সে ছোটমন্ত্রীর পদে উঠিল। বড়মন্ত্রীর পদ খালি হইলে যে তাহাও সে পাইবে, এ কথা সকলেই বলিতে লাগিলেন।

বড়মন্ত্রী লোকটা বড় সুবিধার ছিলেন না। দুঃখীরামকে তিনি ভারি হিংসা করিতেন, আর কী করিয়া তাহাকে জব্দ করিবেন ক্রমাগত তাহাই ভাবিতেন।

এক সওদাগরের সঙ্গে বড়মন্ত্রীর বন্ধুত্ব ছিল। সেই সওদাগরের একটা পক্ষিরাজ ঘোড়া ছিল। পক্ষিরাজ ঘোড়া মানুষের মতো কথা কহিতে পারে, শূন্যে উঠিয়া এক মাসের পথ এক মিনিটে যাইতে পারে, আর ভূত-ভবিষ্যৎ সব বলিয়া দিতে পারে। এই ঘোড়াটাকে পাইবার জন্য মন্ত্রীমহাশয় অনেক দিন হইতে চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু সওদাগর কিছুতেই সেটা তাঁহাকে দিতে চায় না।

এর মধ্যে সওদাগর একবার বিদেশে গিয়াছিল, সেখান হইতে একটা খুব আশ্চর্য আমের আঁটি লইয়া আসিয়াছে। সে আঁটির এই গুণ যে, তাহা পুঁতিবামাত্র গাছ হয়, তাতে তৎক্ষণাৎ আম হয়, তখনই সেটা পাকে, আর তখনই তাহা খাওয়া যায়। খাওয়ার পর আবার সেই আঁটি মাটির ভিতর হইতে তুলিয়া বাক্সে পুরিয়া রাখা যায়।

মন্ত্রীমহাশয় সওদাগরের চাকরকে টাকা দিয়া বশ করিলেন। সে তাঁহার কথায় সওদাগরের আমের আঁটি সিদ্ধ করিয়া রাখিল। তারপর একদিন মন্ত্রীমহাশয় সওদাগরের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বন্ধু, তুমি নাকি ভারি আশ্চর্য একটা আমের আঁটি আনিয়াছ?' সওদাগর বলিল, 'হ্যাঁ বন্ধু, সেটাকে পুঁতিলে তখনই গাছ হয়, তখনই তাতে ফল হয়, তখনই তাহা পাকে, আর তখনই তাহা খাইয়া আঁটিটি আবার বাক্সে রাখিয়া দেওয়া যায়।'

মন্ত্রীমহাশয় নাক মুখ সিঁটকাইয়া বলিলেন, 'ও কথা আমার বিশ্বাস হয় না।'

সওদাগর বলিল, 'আচ্ছা বাজি রাখুন। আমার কথা সত্য হয় তো কী হইবে?' মন্ত্রী বলিলেন, 'তাহা হইলে পরদিন আমার বাড়িতে গিয়া প্রথমে যে জিনিসটাতে হাত দিবে সেইটা তোমার, আর যদি তোমার কথা সত্য না হয়?' সওদাগর বলিল, 'তবে আপনি পরদিন আমার বাড়িতে আসিয়া প্রথমে যাহাতে হাত দিবেন তাহাই আপনার হইবে।'

ঠিক হইল, পরদিন সওদাগরের বাড়িতে মন্ত্রীমহাশয়ের নিমন্ত্রণ, আর তখন আমের আঁটির পরীক্ষা হইবে। আঁটি সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সুতরাং পরীক্ষার ফল কি হইল তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। সওদাগর বেচারার মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। এবারে সে বুঝিতে পারিল যে, আর পক্ষিরাজ ঘোড়াকে রাখিতে পারিবে না।

অনেক ভাবিয়া কোনো উপায় স্থির করিতে না পারিয়া শেষে সওদাগর ছোটমন্ত্রীর কাছে গেল। সেখানে হাতজোড় করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথা নিবেদন করিল। বুদ্ধিমান ছোটমন্ত্রী একটু চিন্তা করিয়া তাহাকে একটা উপায় বলিয়া দিলেন। সওদাগর সন্তুষ্টচিত্তে বাড়ি ফিরিয়া পক্ষিরাজ ঘোড়ার আস্তাবলের দরজা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া নিদ্রা গেল।

পরদিন ভোর হইতে-না-হইতেই মন্ত্রীমহাশয় সওদাগরের বাড়ি গিয়া ডাকিতে লাগিলেন, 'বন্ধু! বন্ধু!' সওদাগর শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। মন্ত্রীমহাশয়ের একটু বসিবার দেরি সয় না। তিনি না বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কই বন্ধু, সে কথার কী হইল?' সওদাগর বলিল, 'আমি প্রস্তুত আছি, এখন আপনার যাহাতে খুশি হাত দিয়া লইয়া যাইতে পারেন।' মন্ত্রীমহাশয় অমনি আস্তাবলের দিকে চলিলেন; সওদাগরও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

আস্তাবলের দরজা বাঁধা ছিল। মন্ত্রীমহাশয় দড়ি ধরিয়া এক টান দিয়া বাঁধন খুলিয়া ফেলিলেন। অমনি সওদাগর বলিল, 'সে কি বন্ধু! আপনার মতোন লোকের ওই সামান্য দড়িগাছটায় লোভ! একটা কোনো দামি জিনিস লইলে সুখী হইতাম।' মন্ত্রীর তো চক্ষু স্থির, অত সহজে ঠকিবেন, তাহা তিনি মনেও করিতে পারেন নাই। সওদাগরের কথার উত্তর দিতে না পারিয়া আমতা আমতা করিয়া ঘরে ফিরিলেন।

পথে যাইতে যাইতে মন্ত্রীমহাশয় স্থির করিলেন যে, ছোটমন্ত্রী ছাড়া এ আর কাহারো কর্ম নয়। তারপর যখন শুনিলেন যে, সেদিন রাত্রে সওদাগর ছোটমন্ত্রীর বাড়ি গিয়াছিল তখন বুঝিলেন, নিশ্চয় ইহা ছোটমন্ত্রীর কাজ।

পরদিন দুপুরবেলা যখন রাজা ঘুমাইতেছিলেন, তখন মন্ত্রীমহাশয় গিয়া জোড়হাতে তাঁহার সামনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। খানিক পরে রাজা চক্ষু মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি বড় মন্ত্রী?' মন্ত্রী বলিলেন, 'দোহাই মহারাজ! সুলক্ষণ সওদাগরের একটা পক্ষিরাজ ঘোড়া আছে কিন্তু মহারাজের আস্তাবলে একটাও পক্ষিরাজ ঘোড়া নাই।' রাজা বলিলেন, 'বটে! ও ঘোড়া আমার চাই।' মন্ত্রী আরো বিনয় করিয়া কাঁদো কাঁদো স্বরে বলিলেন, 'মহারাজের যাহাতে ভালো হয় আমার সেই চেষ্টা, আর ছোটমন্ত্রী দিনরাত তাহাতে বাধা দেন।' রাজা বলিলেন, 'সে কীরকম?' মন্ত্রী বলিলেন, 'মহারাজের জন্য সেই পক্ষিরাজ ঘোড়া আমি আনিতে গিয়াছিলাম কিন্তু ছোটমন্ত্রী সুলক্ষণকে মন্ত্রণা দিয়া সে ঘোড়া আনিতে দেয় নাই।'

রাজাদের মেজাজ সেকালে বড়ই অস্থির ছিল। সহজেই সন্তুষ্ট হইতেন, আর সামান্য কথাতেই চটিয়া উঠিতেন। বকশিশ দিতেন তো অর্ধেক রাজ্যই দিয়া ফেলিতেন, আর সাজা দিতেন তো মাথাটাই কাটিয়া ফেলিতেন। রাজা ছোটমন্ত্রীর ওপর এতদিন সন্তুষ্ট ছিলেন, তাই তাহাকে ছোটমন্ত্রী করিয়াছিলেন। আজ বড়মন্ত্রীর কথা শুনিয়া এতই চটিয়া গেলেন যে, তখনই তাহাকে হাত-পা বাঁধিয়া আনিতে হুকুম দিলেন। বেচারা কোনো বিপদের কথা জানিত না, সুখে ঘুমাইতেছিল, এমন সময় রাজার লোক আসিয়া তাহার হাত-পা বাঁধিয়া লইয়া চলিল।

দুঃখীরামের এই সাজার হুকুম হইল যে, তাহাকে থলের ভিতর পুরিয়া পাথর বাঁধিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হইবে। রাজামহাশয়ের সামনেই থলে আর পাথর আনিয়া সব বাঁধিয়া ঠিক করা হইল, তারপর রাজা চারিটা জল্লাদকে হুকুম দিলেন যে, 'একে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে আয়।'

দুঃখীরামকে সকলেই ভালোবাসিত। সুতরাং তাহার এই সাজার কথা শুনিয়া সকলেরই ভারি ক্লেশ হইল। পথে যাইতে যাইতে জল্লাদেরা চুপি চুপি পরামর্শ করিল যে, এমন ভালো লোককে কখনই সমুদ্রে ফেলিয়া মারা হইবে না। এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা সমুদ্রের ধারে একটা বনের ভিতরে দুঃখীরামকে রাখিয়া থলের মুখ খুলিয়া দিয়া আসিল। আসিবার সময় তাহাকে একখানি কুড়াল আর একটুকরা নেকড়া দিয়া বলিয়া আসিল, 'ছোটমন্ত্রীমশাই, আমরা আর তোমাকে কী দিতে পারি, এই নেকড়া ও কুড়াল নাও, কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করে খেয়ো। তোমার দোহাই ছোটমন্ত্রীমশাই, আমাদের রাজার দেশে যেও না। সেখানে তোমাকে দেখতে পেলে রাজা তোমাকে রাখবে না, আমাদেরও রাখবে না।'

দুঃখীরাম এখন কাঠুরে হইয়াছে, লম্বা লম্বা চুল দাড়িগোঁফ রাখিয়াছে আর নিজের পোশাকটা ফেলিয়া দিয়া সেই জল্লাদের দেওয়া নেকড়াখানা পরে। ভালো করিয়া স্নান না করাতে তাহার গায়ের রঙ ময়লা হইয়া গিয়াছে। পেট ভরিয়া খাইতে না পাওয়াতে ঢের রোগা হইয়া গিয়াছে। এখন তাহাকে দেখিলে আর চট করিয়া চেনা যায় না। এইরূপ অবস্থায় কষ্টে দুঃখীরামের দিন কাটিতে লাগিল।

একদিন কাঠ কাটিতে বাহির হইয়া দুঃখীরাম দেখিল যে, ঝরনার ধারে গাছতলায় এক বুড়ি ঘুমাইতেছে। সে এতই বুড়া হইয়াছে যে, তেমন বুড়ামানুষ আর দুঃখীরাম

কখনো দেখে নাই। বুড়িকে দেখিয়া সে চলিয়া যাইতেছে, এমন সময় দেখিল যে, একটা বিষাক্ত সাপ চুপি চুপি সেই বুড়ির দিকে যাইতেছে। দুঃখীরাম তখনই কুড়াল দিয়া সাপটাকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল আর সেই টুকরাগুলি ঝরনার জলে ফেলিয়া দিল। কী আশ্চর্য! সেই টুকরাগুলি জলে পড়িবামাত্র জলটা টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল। তাহার শব্দ শুনিয়া বুড়ি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিল।

বুড়ি খানিক অবাক হইয়া ঝরনার দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর দুঃখীরামকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কে বাবা?' দুঃখীরাম বলিল, 'আমি দুঃখীরাম।' বুড়ি বলিল, 'বাবা, তুমি কী চাও?' দুঃখীরাম বলিল, 'আমি কিছু চাই না। তুমি বুড়োমানুষ, বনের ভিতর কেন আসিয়াছ? কত জন্তুটন্তু আছে, শীঘ্র চলিয়া যাও।' বুড়ি বলিল, 'বাপু, তুমি আমাকে প্রাণে বাঁচাইয়াছ, আমি তোমাকে কিছু না দিয়া অমনি যাইতে পারিতেছি না।' দুঃখীরাম কিন্তু কিছুই লইবে না, সুতরাং বুড়ি চলিয়া গেল। কিন্তু যাইবার সময় চুপি চুপি বলিয়া গেল, 'তুমি কিছু লইলে না—আচ্ছা, আমি তোমাকে এক বর দিয়া যাইতেছি যে, তুমি যাহা ইচ্ছা কর তাহাই হইবে।' দুঃখীরাম ততক্ষণে কুড়াল হাতে অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে, সুতরাং এ-সকল কথা সে শুনিতে পাইল না।

আজ দুঃখীরামের ঢের বেলা হইয়া গিয়াছে। কখন কাঠ কাটা হইবে, সেই কাঠ বাজারে বিক্রি হইবে, তবে তাহার পেটে দুটি ভাত পড়িবে। এ-সকল কথা ভাবিয়া বেচারির মনটা একটু দুঃখিত ছিল, তাই তত সাবধান হইয়া পথ চলিতে পারিতেছে না। সামনে একটা ছোট গাছ পড়িয়া ছিল, তাহাতে হোঁচট খাইয়া দুঃখীরাম পড়িয়া গেল। একে মন ভালো নাই, তাহার উপর এরূপ দুর্ঘটনা হইলে কাহার না রাগ হয়? দুঃখীরাম রাগিয়া বলিল, 'দূর হ ছাই। এ মুল্লুকে গাছপালা না থাকিলেই ভালো ছিল!'

যেই এ-কথা বলা আর অমনি সেখানকার যত গাছপালা সব কোথায় চলিয়া গেল, যেখানে ভয়ানক বন ছিল, সেখানে খালি মাঠ ধু-ধু করিতে লাগিল। কী সর্বনাশ! এখন কাঠই-বা কোথা হইতে মিলে, আর দুঃখীরামের খাওয়াই-বা কী করিয়া হয়? বেচারা ব্যাপার দেখিয়া একেবারেই অবাক! ইহার কারণ কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া আপনমনে খালি হাঁটিয়া চলিল। বেলা ঢের হইয়াছে, ক্ষুধা আরো বেশি হইয়াছে, এমন অবস্থায় শুধু পথ চলিতেই কত কষ্ট, তাহাতে আবার হাতে প্রকাণ্ড কুড়াল; সে যে-সে কুড়াল নয়, জল্লাদের কুড়াল। সাধারণ কুড়ালের দুখানার সমান তাহার একখানা ভারী হয়। সেদিন দুঃখীরামের কাছে সেটা যেন দশটা কুড়ালের মতো ভারী ঠেকিতে লাগিল, আর সেটাকে বহিয়া নিতে ইচ্ছা হয় না। সুতরাং দুঃখীরাম সেটাকে ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিল, 'আমি আর পারি না, অত ভারী কুড়ালের হাত-পা থাকা উচিত, তাহা হইলে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে পারে।'

কুড়াল তাহাই করিল। কোথা হইতে মাকড়সার পায়ের মতোন তাহার সব পা হইল আর সে টুকটাক করিয়া দুঃখীরামের পিছু পিছু চলিল। দেখিয়া শুনিয়া বেচারার মাথায় আরো গোল লাগিয়া গেল। সে একভাবেই চলিয়া যাইতে লাগিল, আর ভাবিতে লাগিল, হইল কী!

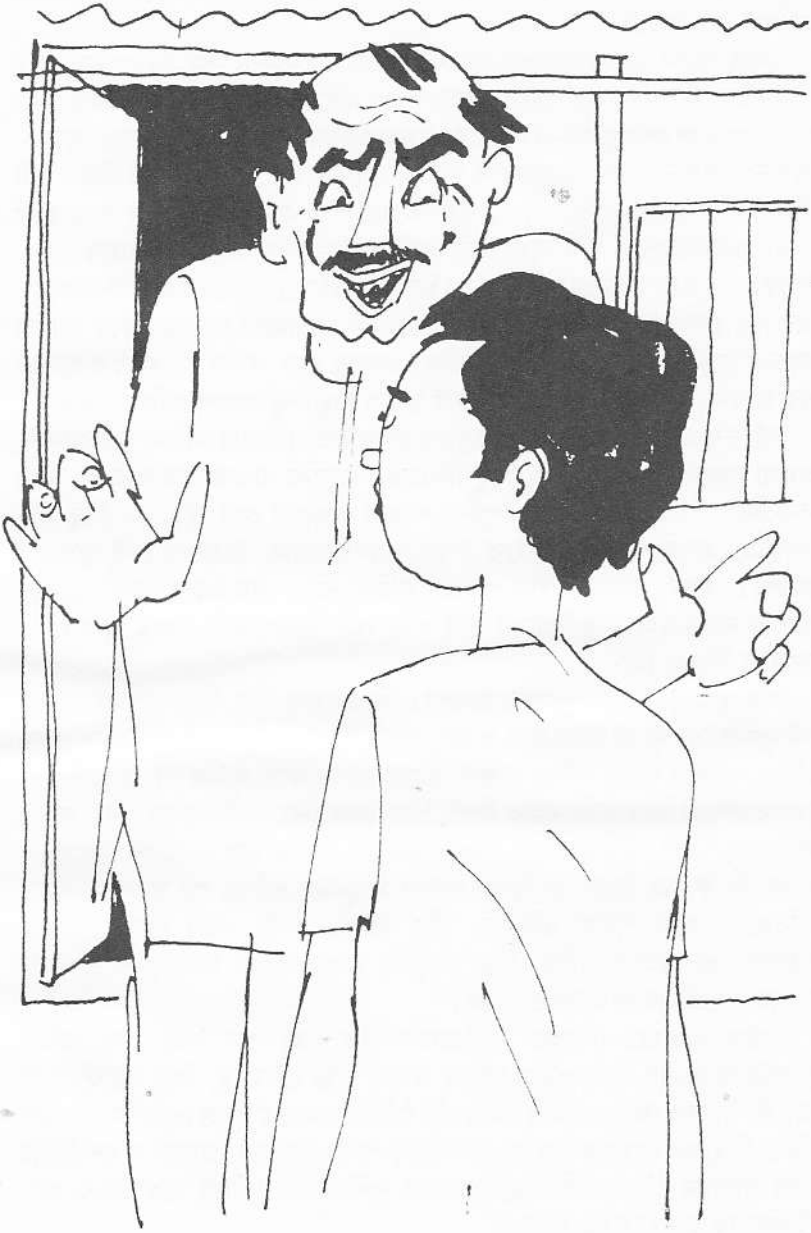

যাইতে যাইতে দুঃখীরাম একেবারে নিজের দেশের বাজারে গিয়া উপস্থিত। প্রভুভক্ত কুড়াল সঙ্গেই আছে; সে এমনিভাবে চলিয়াছে, যেন চিরকাল তাহার ওইরকম করিয়াই চলা অভ্যাস।

একটা কুড়াল যদি লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া তোমার সামনে দিয়া চলিয়া যায়, তুমি তাহা হইলে কী কর? আর তেমন একটা কুড়াল যদি বাজারে গিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বাজারের লোকগুলিই-বা কী করে? বাজারে প্রথম মোড়েই এক গোয়ালার দোকান। সেখানে এক বড়লোকের দারোয়ান ঘি কিনিতে আসিয়াছে। গোয়ালার হাতে ঘিয়ের বাটি দিয়া সবে সে পৈঠায় বসিয়া তামাকু খাইবার আয়োজন করিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখে, দুঃখীরামের সেই কুড়াল হাত-পাসুদ্ধ একেবারে তাহার সামনে উপস্থিত! 'হায় বাপ' বলিয়া চারি হাত-পা ঊর্ধ্বে উঠাইয়া দারোয়ানজি আপনিই একলাফে একেবারে গোয়ালার ঘাড়ে গিয়া উঠিল। গোয়ালাও তাড়াতাড়ি দারোয়ানজিকে ঠেলিয়া মাখনের হাঁড়ি ফেলিয়া, ঘরে দরজা আঁটিল। তারপর যখন দেখিল যে, সেটা কাহাকেও কিছু বলে না, তখন দরজা খুলিয়া দুজনেই তাহার পিছু পিছু তামাশা দেখিতে চলিল।

সেদিন বাজারে কেনাবেচা বন্ধ। বাবুদের চাকর যাহারা বাজার করিতে আসিয়াছিল, তাহারা সকলেই কুড়ালের পিছু পিছু চলিয়াছে, তাহাদের বাজার করা আর হয় নাই। দোকানিরাও তাহাই করিতেছে—পুলিশ-পাহারা সকলেই সেই কুড়ালের পিছু পিছু চলিয়াছে। চাকরদের সন্ধান লইতে বাবুরা আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেই কুড়ালের তামাশা দেখিতেই রহিয়া গেলেন। এইরূপ করিয়া দেশের প্রায় সকল লোক সেইখানে আসিয়া জড়ো হইল। দুঃখীরামের সেই মামা আর মামাত ভাই—কেষ্ট আর হরিও তাহাদের ভিতরে ছিল।

কেষ্ট আর হরি প্রথমে কুড়ালের তামাশা দেখিতেই ব্যস্ত ছিল, কিন্তু তারপর একবার যেই দুঃখীরামের মুখের উপর চোখ পড়িল, অমনি তাহাদের বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল। ভালো করিয়া দেখিয়া তাহারা বেশ বুঝিতে পারিল যে, এ দুঃখীরাম। সুতরাং তাহারা তাড়াতাড়ি মন্ত্রীর নিকট গিয়া খবর দিল, 'মন্ত্রীমহাশয়, সেই দুখেটা আসিয়াছে।' মন্ত্রী অবিলম্বে এই সংবাদ রাজাকে দিলেন আর বলিলেন, 'মহারাজ, কুড়াল কি কখনো হাঁটে? এ নিশ্চয় কোনো জাদু-টাদু শিখিয়া বদ মতলবে এখানে আসিয়াছে।' রাজা শুনিয়া বলিলেন, 'ঠিক বলিয়াছ মন্ত্রী, এখনি দশজন সিপাহি পাঠাইয়া দাও, উহাকে বাঁধিয়া নিয়া আসুক।' রাজার হুকুমে দানবের মতো দশটা পালোয়ান দুঃখীরামকে আনিতে চলিল।

এদিকে বাজারের লোকেরা দুঃখীরামকে তত গ্রাহ্য করে নাই, কিন্তু তাহার কুড়ালটাকে রাজার কাছে লইয়া যাইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সে কুড়ালের গায়ে কী ভয়ানক জোর! তাহার গলায় দড়ি বাঁধিয়া বাজারের সমস্ত লোক মিলিয়া কত টানিল, কিছুতেই তাহাকে এক পা-ও নাড়িতে পারিল না; বরং তাহারা যে দশ মিনিট ধরিয়া প্রাণপণে 'হিঁয়ো' করিয়াছে, ততক্ষণে দুঃখীরামের কুড়ালই তাহাদিগকে আধ মাইলখানেক টানিয়া লইয়া গিয়াছে।

এমন সময় রাজার পালোয়ানেরা আসিয়া দুঃখীরামকে বাঁধিতে লাগিল। দুঃখীরামের কাছে আজ আর কিছুই আশ্চর্য বলিয়া বোধ হয় না। সে কেবল দেখিতেছে, এরপর কী হয়। স্বয়ং বড়মন্ত্রী পালোয়ানদের সঙ্গে আসিয়াছেন, আর বলিতেছেন, 'শক্ত করিয়া বাঁধ।' এ-কথা শুনিয়া দুঃখীরাম নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিল, 'অন্যের বেলা বলা খুব সহজ; তোমাকে একবার ওরকম করিয়া বাঁধিত, তবে দেখিতে কেমন লাগে।'

অমনি চারটা পালোয়ান মন্ত্রীমহাশয়কে চিৎ করিয়া ফেলিয়া ঠিক দুঃখীরামের মতোন করিয়া বাঁধিতে লাগিল। মন্ত্রীমহাশয় প্রথমে আশ্চর্য বোধ করিলেন, তারপর চটিয়া লাল হইলেন ; কিন্তু পালোয়ানেরা তাঁহাকে গ্রাহ্য করিল না। রাগে মন্ত্রীমহাশয়ের কথা বাহির হইতেছে না, চোখদুটো ফুটিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে, গলার শির ফুলিয়াছে, মুখে ফেনা উঠিতেছে। কিন্তু পালোয়ানেরা তথাপি তাঁহাকে বাঁধিতে কসুর করিতেছে না। বেশ করিয়া বাঁধিয়া তারপর পরীক্ষা করিয়া দেখিল, ঠিক দুঃখীরামের মতোন বাঁধা হইয়াছে কি না। যখন দেখিল যে দুজনকেই ঠিক একরকম করিয়া বাঁধা হইয়াছে, তখন তাঁহাদিগকে কাঁধে করিয়া রাজার নিকট লইয়া চলিল। বাজারের লোকেরা এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

এই-সকল লোক যখন রাজার কাছে উপস্থিত হইল, তখন রাজামহাশয়ের ভারি রাগ হইল এমনও নহে। মন্ত্রীর বাঁধন তিনি নিজ হাতে খুলিয়া দিলেন, তারপর তাঁহাকে লইয়া দুঃখীরামের বিচার করিতে বসিলেন। যে-সকল পালোয়ান মন্ত্রীমহাশয়কে বাঁধিয়া আনিয়াছিল, প্রথমে তাহাদের ফাঁসির হুকুম হইল। দুঃখীরামের সম্বন্ধে একটা হুকুম দিবার পূর্বেই আহারের সময় হওয়াতে মাঝখানে রাজামহাশয় উঠিয়া গেলেন, খাওয়াদাওয়ার পর দুঃখীরামের হুকুম হইবে।

দুঃখীরাম বেচারা সেই বাঁধা অবস্থাতেই পড়িয়া আছে। তাহার চারধারে বিস্তর প্রহরী আছে, দর্শকদিগেরও অধিকাংশই রহিয়া গিয়াছে। দুঃখীরামের দুঃখের কথা আর কী বলিব ! অন্য কষ্টের বিষয় আর এখন ততটা ভাবে না; কিন্তু ক্ষুধা তো কিছুতেই থামিয়া থাকিবার নহে। রাজামহাশয়, মন্ত্রীমহাশয়, সকলেই আহার করিতে গিয়াছেন। কত সুখাদ্য জিনিস খাইয়া তাঁহারা পেট ভরিয়া আসিবেন। দুঃখীরাম দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, 'আহা, ও-সব জিনিস যদি আমাকে কেহ এখন আনিয়া দিত !'

রাজামহাশয় আহারে বসিয়াছেন, সোনার পাত্রে শত ব্যঞ্জন সাজাইয়া তাঁহার সামনে রাখা হইয়াছে, তাহার সুগন্ধ নাকে গেলে লম্বা লম্বা নিশ্বাস টানিতে ইচ্ছা হয়, জিভে জল আসে। হাত ধুইয়া সবে রাজামহাশয় খাইবার উপক্রম করিয়াছেন, অমনি থালাসুদ্ধ খাবার জিনিস কোথায় মিলাইয়া গেল ! মন্ত্রীমহাশয়েরও ঐরূপ দশা হইল।

এদিকে দুঃখীরামের আক্ষেপ শেষ হইতে-না-হইতেই তাহার সামনে রাজা ও মন্ত্রীর আহারের সমস্ত আয়োজন আসিয়া হাজির হইল। দুঃখীরাম তাহাতে কিছুই আশ্চর্য বোধ করিল না ; তাহার খালি দুঃখ হইতে লাগিল, 'হায় রে, হাত-পা বাঁধা !' বলিতে বলিতে তখনি তাহার বাঁধন খুলিয়া গেল, সে একলাফে উঠিয়া বসিয়া দুহাতে লুচি, মাংস, পোলাও, পায়েশ, মিঠাই, মোণ্ডা মুখে পুরিতে লাগিল।

প্রহরীরা ব্যাপার দেখিয়া এতক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া ছিল। হঠাৎ তাহাদের চৈতন্য হইল। একজন বলিল, 'আরে ধর পালাবে।' আর-একজন বলিল, 'কোথায় আর পালাবে, আমরা এতজন চারধারে দাঁড়িয়ে আছি। আহা বেচারার সামনে এত জিনিস এসেছে, একটু খেয়ে নিতে দে।' ও কথা শুনিয়া সকলেই বলিল, 'আহা, খাক খাক্!' দুঃখীরাম ইহাতে নিতান্ত কৃতার্থ হইয়া বলিল, 'বাপুসকল তোমরা রাজা হও।'

সেই রাজসভায় রাজার সিংহাসন ছিল; দেখিতে দেখিতে সেখানে তেমনি আরো হাজারটা সিংহাসন হইল। তারপর সক্কলেরই রাজার মতো বেশভূষা হইল, আর তাহারা এক-একটা সিংহাসনে উঠিয়া বসিল।

রাজামহাশয় সভায় আসিয়া দেখেন, তাঁহার মতোন ঢের রাজা সভায় বসিয়া আছে। তাহারা তাঁহাকে বলিল, 'মহারাজ, উহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক।' রাজা আর কী করেন, এতগুলি রাজার অনুরোধ ঠেলিয়া ফেলা তো সহজ কথা নয়। কাজেই দুঃখীরাম তাড়াতাড়ি খালাস পাইল।

এমন সময় মন্ত্রীমহাশয় আসিয়া উপস্থিত। তিনি এতগুলি রাজাকে একঠাঁই দেখিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। যেদিকে চান সেই দিকেই রাজা, আর মন্ত্রীমহাশয় খালি দু হাতে সেলাম করেন! সেদিন পেটে ভাত অল্পই পড়িয়াছিল, তাহাও হাজার রাজাকে সেলাম করিতে করিতে কখন হজম হইয়া গেল।

দুঃখীরামের কথা শুনিয়া মন্ত্রীমহাশয় যারপরনাই ব্যস্ত হইলেন। জোড়হাতে তিনি রাজাদিগকে অনুনয় করিতে লাগিলেন, 'দোহাই ধর্মাবতারগণ, পুনরায় ইহার বিচার করিতে আজ্ঞা হয়। এমন দুষ্ট লোককে সহজে ছাড়িয়া দিবেন না, কখন কার সর্বনাশ করে তার ঠিক নাই।' এই কথা শুনিয়া রাজাদের ভিতর হইতে একজন বলিল, 'সর্বনাশটা যে কে করলে তা তো বুঝতে পারছি না। আমি তোমার মেথর ছিলাম, আর আজ আমাকে রাজা করে দিয়েছে। এই এখনি তুমি দুহাতে আমাকে কত সেলাম করলে!'

মন্ত্রীমহাশয় আশ্চর্য হইয়া দেখিলেন, সত্যি সত্যি তাঁহার মেথর রাজা সাজিয়া বসিয়া আছে, আর তিনি তাহাকে সেলাম করিয়াছেন। ক্রমে দেখা গেল যে যত রাজা বসিয়া আছে সকলেই কেহ সহিস, কেহ পাইক, কেহ দারোয়ান, কেহ দোকানি, কেহ ভিখারি।

রাজামহাশয় আর মন্ত্রীমহাশয় লজ্জা রাখিবার আর স্থান পান না। রাজা তাড়াতাড়ি হুকুম দিলেন, 'আবার বিচার হইবে, উহাকে ধর।' কিন্তু কে ধরিবে? সবাই রাজা সাজিয়া বসিয়াছে, হুকুম খাটিতে কাহারো ইচ্ছা নাই। অগত্যা মন্ত্রীমহাশয়ই ধরিতে গেলেন। দুঃখীরাম তাহা দেখিয়া বলিল, 'মন্ত্রীমহাশয়, অত কষ্ট করেন কেন? এই যে আমি হাজির আছি। কিন্তু আমার প্রাণদণ্ড হইলে আমাকে মারিবে কে? জল্লাদ যে রাজা হইয়া গিয়াছে। এখন আপনি আর রাজামহাশয় জল্লাদ হইলে তবে হয়।'

বলিতে বলিতে রাজা ও মন্ত্রীর সেই সুন্দর চেহারা আর জমকালো পোশাক কোথায় চলিয়া গেল, তাহার পরিবর্তে নেংটি-পরা, কুড়াল-হাতে, কালোভূত দুই জল্লাদ সাজিয়া, জোড়হাতে হুকুমের অপেক্ষা করিতে লাগিল। এখন হুকুম দেয় কে?

দুঃখীরাম এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছে যে, যে কারণেই হউক, সে যে-ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে, ঘটনায় তাহাই হইতেছে। ইচ্ছা করিলে এখন সে কি না করিতে পারিত। কিন্তু সে বলিল, 'মহারাজ, আপনার নুন খেয়েছি, আপনার নিকট অকৃতজ্ঞ হইব না। আপনার রাজত্ব আপনারই রহিল। এখন আমাকে বিদায় দিতে আজ্ঞা হউক।'

লজ্জায় রাজামহাশয় মাথা হেঁট করিয়া আছেন। দুঃখীরামের কথার তিনি আর কী উত্তর দিবেন! কেবল বলিলেন, 'আমার সমস্ত রাজ্যই তুমি লইতে পারিতে, ইচ্ছা করিলে আমায় প্রাণেও মারিতে পারিতে। এখন তুমি যাহা বলিলে তাহাতে বুঝিলাম, তুমি মহৎ লোক। আমার অর্ধেক রাজ্য তোমার হউক, আমার কন্যাকে তুমি বিবাহ করিয়া সুখে রাজত্ব করো।'

দুঃখীরাম রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া পরমসুখে রাজত্ব করিতে লাগিল।

আর-সকলের কী হইল? মন্ত্রীমহাশয়ের সম্বন্ধে দুঃখীরাম কিছু বলে নাই, সুতরাং তিনি জল্লাদই রহিয়া গেলেন। যাহারা রাজা হইয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে এক নতুন মুশকিল উপস্থিত হইল।

রাজা হইয়াছে বটে, কিন্তু রাজ্য কোথায় পাইবে? অথচ সকলেই বলে, 'আমি রাজা হয়েছি যে, কাজ কেন করব?' ইহাতে ভারি অসুবিধা হইতে লাগিল। দুঃখীরাম বলিল, 'বাপুসকল, তোমাদের রাজা-টাজা হইয়া কাজ নাই, তোমরা যার-যার যোগ্যতা অনুসারে কাজকর্ম কর গিয়া, আর সৎপথে থাকিয়া সুখে তোমাদের দিন কাটুক।'

ছোট ভাই

সাতটি ভাই ছিল, তাহাদের সকলের ছোটটির নাম ছিল রুরু। দেশের মধ্যে তারা সাতটি ভাই দেখতে আর-সকল ছেলের চেয়ে সুন্দর ছিল; তাদের মধ্যে আবার রুরু ছিল সকলের চেয়ে সুন্দর। রুরুকে সকলেই কেন এত সুন্দর বলে আর তাদের বলে না, এইজন্য রুরুর বড় ভাইয়েরা তাকে বড্ড হিংসা করত। ভালো ভালো কাপড়গুলো সব তারা ছয়জনায় পরে বেড়াত, রুরুকে পরতে দিত শুধু ছেঁড়া ন্যাকড়া। যত বিচ্ছিরি নোংরা কাজ, সব তারা রুরুকে দিয়ে করাত, আর নিজেরা বাবুগিরি করে বেড়াত। তবু সকল লোকে রুরুকেই বেশি ভালোবাসত, বড় কটিকে কেউ দেখতে পারত না। তাতে তারা আরো চটে রুরুকে যখন-তখন ধরে ঠ্যাঙাত। বেচারাকে একদণ্ডও সুখে থাকতে দিত না।

রুরুদের গ্রাম থেকে ঢের দূরে ররঙ্গা বলে একটি মেয়ে থাকত। এমন সুন্দর মেয়ে এই পৃথিবীতে আর কোথাও ছিল না। তার কথা শুনেই রুরুর দাদারা বলল, 'চল, আমরা সেই মেয়েকে দেখতে যাব। আমাদের মতো সুন্দর ছেলে আর কোথায় আছে? আমাদের দেখলেই নিশ্চয় সেই মেয়ে আমাদের একজনকে বিয়ে করে ফেলবে।'

তখন তো তাদের খুবই আনন্দ আর উৎসাহ হল। ছয়জনের প্রত্যেকে ভাবল, 'ররঙ্গা নিশ্চয়ই আমাকেই বিয়ে করবে।' কত গহনা এনে যে তারা তাদের ছয়টি পুঁটলির ভিতরে পুরল, তার লেখাজোখা নেই। মস্তবড় পানসি তাদের জন্য তয়ের হল। ছয়ভাই মিলে আজ কতরকম করেই পোশাক পরেছে আর চুল আঁচড়েছে; একটু পরে পানসিতে চড়ে বউ আনতে যাবে।

তাদের মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁ রে, তোরা রুরুকে সঙ্গে নিবি না?' অমনি তারা ছয়জন একসঙ্গে বলল, 'নেব বৈ কি। নইলে আমাদের রান্না কে করবে? ররঙ্গাকে দেখতে যাবার সময় আমরা তাকে আমাদের বাসায় রেখে যাব। ও যে ছেঁড়া কাপড় পরে, ও আমাদের ভাই, এ কথা জানলে লোকে কী বলবে?'

রুরু সবই শুনল, কিন্তু কিচ্ছু বলল না। সে-ও তার দাদাদের সঙ্গে সেই পানসি চড়ে ররঙ্গাদের দেশে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানকার লোকেরা এর আগেই শুনতে পেয়েছিল যে, কয়েকটি খুব সুন্দর ছেলে তাদের দেশে বউ খুঁজতে যাচ্ছে। তারা সেই পানসি পৌঁছিবামাত্রই এসে রুরুর দাদাদের আদর করে তাদের গ্রামে নিয়ে গেল। সেখানে তারা বাড়ি-ঘর সাজিয়ে মস্ত ভোজের আয়োজন আগেই করে রেখেছিল।

ছয়ভাই হাসতে হাসতে দুলতে দুলতে তাদের সঙ্গে চলে গেল। রুরুকে বলে গেল, 'আমাদের জন্য একটি বাসা ঠিক করে জিনিসপত্র সব তাতে নিয়ে রাখবি।'

তারপর তাদের খাওয়াদাওয়া, আমোদ–আহ্লাদ খুবই হল। সেখানে অনেক মেয়ে ছিল, কিন্তু তাদের কোন্‌টি যে ররঙ্গা, ছয়ভাইয়ের কেউ তা বুঝতে পারল না। তাদের প্রত্যেকেই তার পাশের মেয়েটিকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করল, 'কোন্‌টি ররঙ্গা?' সেই মেয়েদের প্রত্যেকেই বলল, 'আমিই ররঙ্গা, কাউকে বোলো না।'

এ–কথা শুনে তো আর ভাইদের আনন্দের সীমা রইল না। অত সহজে ররঙ্গাকে পেয়ে যাবে, তা তারা মোটেই ভাবেনি। তারা তখনই সেই মেয়েগুলোর সঙ্গে বিয়ের কথা ঠিক করে ফেলল। তারপর কয়েক দিনের মধ্যেই তাদের বিয়ে হয়ে গেল। সকলেই ভাবল, ররঙ্গাকে বিয়ে করেছে। ঠকেছে যে, সে কথা কারুরই মনে হল না।

রুরু বেচারা এত কথার কিচ্ছু জানে না, আর তার জানবার দরকারই–বা কী? প্রথম দিন বাসা ঠিকঠাক করে সে কলসি হাতে জল আনতে বেরিয়েছিল। জল কোথায় আছে তা তো সে আর জানে না, তাই সে একটি ছোট্ট মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁ গা, কোথায় জল পাব?' মেয়েটি বলল, 'ওই যে ররঙ্গার বাড়ি, তারই পাশে ঝরনা আছে।'

রুরু সেই দিকে জল আনতে চলল। যেতে যেতে সে ভাবল, 'ররঙ্গা তো ভোজে গিয়েছে; এর মধ্যে আমি একটু উঁকি মেরে দেখে নিই না, তার বাড়িটি কেমন।' এই ভেবে সে আস্তে আস্তে সেই ঘরটির দরজার কাছে গিয়ে উঁকি মারল। উঁকি মেরে আর তার সেখান থেকে চলে আসবার কথা মনে রইল না। সে দেখল, ঘরের ভিতরে ররঙ্গা বসে আছে! নিশ্চয় সে ররঙ্গা, নইলে এত সুন্দর আর কে হবে?

ররঙ্গা তাকে দেখেই ভারি খুশি হয়ে অমনি তাকে ডাকল, 'এস, এস, ঘরে এস।' রুরু জড়সড় হয়ে ঘরে গেল। তখন ররঙ্গা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কে?' রুরু বলল, 'সেই যে ছয়জন লোক বউ খুঁজতে এসেছে, যাদের জন্য ভোজ হচ্ছে, আমি তাদের ছোটভাই।' ররঙ্গা বলল, 'তুমি কেন তবে ভোজে যাওনি?' রুরু বলল, 'আমাকে তারা নিয়ে যায় নি, কাজ করবার জন্য বাসায় রেখে গেছে। আমার এর চেয়ে ভালো কাপড় নেই। এগুলো কাজ করতে করতে ময়লা হয়ে ছিঁড়ে গেছে।'

রুরুকে দেখেই ররঙ্গা'র যারপরনাই ভালো লেগেছিল, তার কথা শুনে তার বড়ই দুঃখ হল। সে বুঝতে পারল যে রুরুর দাদারা বড় দুষ্টু, তাকে কষ্ট দেয়। তখন রুরুকে তার আরো ভালো লাগল। দুদিন পরে তাদের বিয়েও হয়ে গেল।

তার পরদিন রুরুর দাদারা বউ নিয়ে ঘরে যাবে। রুরু যে তার আগেই ররঙ্গাকে নিয়ে নৌকার তলায় লুকিয়ে রেখেছে, সে কথা তাদের কেউ টের পায় নি। তারা ভারি ধুমধাম করে দেশে এল। তারপর বউ নিয়ে বাড়িতে পা দিয়েই সকলের বড়ভাই তাদের মাকে বলল, 'এই দেখো মা, ররঙ্গাকে বিয়ে করে এনেছি!' অমনি তার ছোটভাই তার চেয়ে বেশি করে চেঁচিয়ে বলল, 'না মা, ও মিছে কথা বলছে, আমি ররঙ্গাকে এনেছি।'

তখন তো ভারি মজা হল। সবাই বলছে, 'ওদের কথা মিথ্যে, আমি ররঙ্গাকে এনেছি।'

ভয়ানক চটাচটি, মারামারি হয় হয়। বউ কটি থতমত খেয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে, তারা ভাবেনি যে অত সহজে ধরা পড়ে যাবে।

তখন মা বললেন, 'বাবা, ররঙ্গা তো ছটি নয়, আর এদের একটিও তেমন সুন্দরী নয়। তোমরা ঠকে এসেছ।' রুরু এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, মা'র কথা শুনে সে বলল, 'ঠিক বলেছ মা, ঠকে এসেছে। আমার সঙ্গে এস, আমি ররঙ্গাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

এ কথায় রুরু'র দাদারা তো হেসেই গড়াগড়ি দিতে লাগল; কিন্তু মা বললেন, 'আচ্ছা গিয়েই দেখি না।' বলেই তিনি রুরুর সঙ্গে নৌকোয় এলেন, আর একটিবার ররঙ্গার মুখের দিকে চেয়েই তাকে কোলে নিয়ে আনন্দে নাচতে লাগলেন। সে খবর দেখতে দেখতে গ্রামময় ছেয়ে ফেলল। তখন পাড়ার ছেলে, বুড়ো, গিন্নি, বউ সকলে ছুটে এসে ররঙ্গাকে ঘিরে নাচতে লাগল।

এ-সব দেখে দাদারা চোখ লাল করে, দাঁত খিঁচিয়ে তাদের স্ত্রীদের বলল, 'বটে? ফাঁকি দিয়েছিস?' শুনে সকলে হো হো করে হাসল। তাদের মা বললেন, 'আর কেন বাছা? চুপ করো! তোমরা যেমন, তোমাদের তেমনি জুটেছে।'

সাতমার পালোয়ান

এক রাজার দেশে এক কুমার ছিল ; তার নাম ছিল কানাই।

কানাই কিছু একটা গড়িতে গেলেই তাহা বাঁকা হইয়া যাইত; কাজেই তাহা কেহ কিনিত না। কিন্তু তাহার স্ত্রী খুব সুন্দর হাঁড়ি-কলসি গড়িতে পারিত। ইহাতে কানাইয়ের বেশ সুবিধা হইবারই কথা ছিল। সে সকল মেহন্নত তাহার স্ত্রীর ঘাড়ে ফেলিয়া সুখে বেড়িয়া বেড়াইতে পারিত। কিন্তু তাহার স্ত্রী বড়ই রাগী ছিল, কানাইকে আলস্য করিতে দেখিলেই সে ঝাঁটা লইয়া আসিত। সুতরাং মোটের উপর বেচারার কষ্টই ছিল বলিতে হইবে।

একদিন কানাইয়ের স্ত্রী কতকগুলি হাঁড়ি রোদে দিয়া বলিল, 'দেখ যেন কিছুতে মাড়ায় না।'

কানাই কিছু চিঁড়ে আর ঝোলাগুড় এবং একটা লাঠি লইয়া হাঁড়ি পাহারা দিতে বসিল। এক-একবার চিঁড়ে খায় আর এক-একবার হাঁড়ির পানে তাকাইয়া দেখে, কিছুতে মাড়াইল কি না।

কানাইয়ের ঝোলাগুড়ের খানিকটা কেমন করিয়া হাঁড়ির উপর পড়িয়াছিল, অনেকগুলি মাছি আসিয়া তাহা খাইতে বসিয়া গেল। কানাই তাহা দেখিয়া বলিল, 'বটে! হাঁড়ি মাড়াচ্ছ? আচ্ছা, রোসো!' এই বলিয়া তাহার লাঠি দিয়া মাছিগুলোকে এমনি এক ঘা লাগাইল যে তাহাতে মাছিও মরিয়া গেল, হাঁড়িও গুঁড়া হইয়া গেল।

কানাই গণিয়া দেখিল যে, সাতটা মাছি মরিয়াছে। তাহাতে সে লাঠি বগলে করিয়া ভারি গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। হাঁড়ি ভাঙার শব্দ শুনিয়া তাহার স্ত্রী ঝাঁটা হাতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কী হয়েছে?' কানাই কথা কয় না। তাহার স্ত্রী যতই জিজ্ঞাসা করে, সে খালি আরো গম্ভীর হইয়া যায়।

শেষটা যখন তাহার স্ত্রী বাড়াবাড়ি করিল, তখন সে চোখ লাল করিয়া বলিল, 'দেখ্, হিসেব করে কথা কোস। এক ঘায় সাতটা মেরেছি, জানিস?'

কানাই আর কাহারো সঙ্গে কথা কয় না। বেশি পীড়াপীড়ি করিলে খালি বলে, 'হিসেব করে কথা কোস্। এক ঘায় সাতটা মেরেছি, জানিস?'

শেষে একদিন কানাই এক থান মার্কিন দিয়া মাথায় একটা পাগড়ি বাঁধিল। বনের ভিতর হইতে বাঁশ কাটিয়া একটা ভয়ানক মোটা লাঠি তয়ের করিল। তারপর পিরান গায়ে দিয়া কোমর বাঁধিয়া, ঢাল হাতে করিয়া, জুতা পায় দিয়া, রাজার বাড়িতে

পালোয়ানগিরি করিতে চলিল। যাইবার সময় তাহার স্ত্রীকে বলিয়া গেল—'আমি আর তোদের এখানে থাকব না। আমি এক ঘায় সাতটা মারতে পারি।'

পথের লোক জিজ্ঞাসা করে, 'কানাই কোথায় যাও?' কানাই সে কথার কোনো উত্তর দেয় না। সে মনে করিয়াছে যে এখন হইতে আর কানাই বলিয়া ডাকিলে উত্তর দিবে না। সে এক ঘায় সাতটা মারিয়া ফেলিয়াছে! এখন কি আর তাহাকে কানাই ডাকা সাজে? এখন তাহাকে বলিতে হইবে, 'সাতমার পালোয়ান।'

রাজার নিকট গিয়া কানাই জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল। রাজা তাহার সেই এক থান মার্কিনের পাগড়ি দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার নাম কী হে?' কানাই বলিল, 'মহারাজ, আমার নাম সাতমার পালোয়ান। আমি এক ঘায় সাতটাকে মারতে পারি।'

কানাই রাজার বাড়িতে পালোয়ান নিযুক্ত হইল। মাইনে পঞ্চাশ টাকা। এখন তার দিন সুখেই যায়।

ইহার মধ্যে একদিন সেই রাজার দেশে এক বাঘ আসিয়া উপস্থিত। সে মানুষ মারিয়া, গরু-বাছুর খাইয়া, দৌরাত্ম্য করিয়া দেশ ছারখার করিবার জোগাড় করিল। যত শিকারি তাহাকে মারিতে গেল, সব কটাকে সে জলযোগ করিয়া ফেলিল। রাজামহাশয় অবধি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, 'দেশ আর থাকে না।'

এমন সময় কোথাকার এক দুষ্ট লোক আসিয়া রাজার কানে কানে বলিল, 'রাজামহাশয়, এত যে ভাবছেন, তবে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে পালোয়ান রেখেছেন কী করতে? তাকে ডেকে কেন বাঘ মেরে দিতে হুকুম করুন না।'

রাজা বলিলেন, 'আরে তাই তো! ডাক্ পালোয়ানকে!'

রাজার তলব পাইয়া কানাই আসিয়া হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইলে রাজা বলিলেন, 'সাতমার পালোয়ান, তোমাকে ওই বাঘ মেরে দিতে হবে। নইলে তোমার মাথা কাটব।'

কানাই লম্বা সেলাম করিয়া বলিল, 'বহুত আচ্ছা মহারাজ, এখনি যাচ্ছি।'

ঘরে আসিয়া কানাই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। হায়, হায়! এমন সুখের চাকরিটা আর রহিল না, সঙ্গে সঙ্গে বুঝি প্রাণটাও যায়! কানাই বলিল, 'এখন আর কী? বাঘ মারতে গেলে বাঘে খাবে, না গেলে রাজা মারবে। দূর হোক গে, আমি আর এ দেশে থাকব না।'

সেদিন সন্ধ্যার পর কানাই তাহার পাগড়িটা মাথায় জড়াইল, কোমরটা আঁটিয়া বাঁধিল। এক হাতে ঢাল, আর-এক হাতে ডাণ্ডা, পিঠে পুঁটুলি, পায়ে নাগরা জুতো। সকলে মনে করিল, সাতমার পালোয়ান বাঘ মারিতে চলিয়াছে। কানাই মনে করিল, এ রাজার দেশ ছাড়িয়া যাইতে হইবে। যত শীঘ্র যাওয়া যায় ততই ভালো। একটা ঘোড়া হইলে আরো শীঘ্র শীঘ্র যাওয়া হইত।

ততক্ষণে বাঘ করিয়াছে কী—এক বুড়ির ঘরের পিছনে চুপ মারিয়া বসিয়া আছে। ইচ্ছাটা, বুড়ি কিংবা তাহার নাতনি একটিবার বাহিরে আসিলেই ধরিয়া খাইবে। বুড়ি ঘরের ভিতরে লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়াছে। তাহার বাহিরে আসিবার ইচ্ছা একেবারেই নাই। এতক্ষণে যে কখন ঘুমাইয়া পড়িত, খালি নাতনিটার জ্বালায় পারিতেছে না। বুড়ি অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তাহাকে ঘুম পাড়াইতে পারে নাই। শেষে রাগিয়া বলিল, 'তোকে

বাঘে ধরে নেবে।' নাতনি বলিল, 'আমি বাঘে ভয় করি না'। বুড়ি বলিল, 'তবে তোকে ট্যাঁপায় নেবে।'

বাস্তবিক ট্যাঁপা বলিতে একটা কিছু নাই, বুড়ি তাহার নাতনিকে ভয় দেখাইবার জন্যই ওই নামটা তয়ের করিয়াছিল। কিন্তু বাঘ ঘরের পিছন হইতে ট্যাঁপার নাম শুনিয়া ভারি ভয় পাইয়া গেল! সে মনে মনে বলিল, 'বাপ রে! আমাকে ভয় করে না, কিন্তু ট্যাঁপাকে ভয় করবে! সেটা না-জানি তবে কেমন ভয়ংকর জানোয়ার। যদি একবার সেই জানোয়ারটা এই দিক দিয়ে আসে, তা হলেই তো মুশকিল দেখছি।'

অন্ধকারে বসিয়া বাঘ এইরূপ ভাবিতেছে, আর ঠিক এমনি সময় কানাই সেই পথে পলায়ন করিতেছে। বাঘকে দেখিয়া কানাই মনে মনে ভাবিল, 'বাহ্, এই তো একটা ঘোড়া বসে আছে!' এই বলিয়াই সে কোমরের কাপড়টা খুলিয়া বাঘের গলায় বাঁধিল।

অন্ধকারে বাঘকে কানাই ভালো করিয়া চিনিতে পারে নাই। বাঘও কানাইকে তাহার পাগড়ি-টাগড়ি সুদ্ধ একটা নিতান্তই অদ্ভুত জন্তুর মতোন দেখিল।

একটা মানুষ হঠাৎ আসিয়া যে তার মতোন জন্তুর সামনে এতটা বেয়াদবি করিয়া বসিবে, এ কথা তাহার মাথায় ঢুকে নাই। সে বেচারা নেহাত ভয় পাইয়া ভাবিতে লাগিল—'এই রে, মাটি করেছে। আমাকে ট্যাঁপায় ধরেছে!'

কানাই ভাবিল, 'ঘোড়া যখন পেয়েছি, তখন আর তাড়াতাড়ি কিসের? ঘরে একটু ঘুমোই, তারপর শেষরাত্রে ঘোড়ায় চড়ে ছুট দেব।' এই ভাবিয়া সে বাঘকে তাহার বাড়ির পানে টানিয়া লইয়া চলিল। বাঘ বেচারা আর কী করে! সে মনে করিল, 'এখন ট্যাঁপার হাতে পড়েছি, এর কথামতনই চলতে হবে।'

বাড়ি আসিয়া কানাই বাঘকে একটা ঘরে বন্ধ করিয়া দরজা আঁটিয়া দিল। তারপর বিছানায় শুইয়া ভাবিতে লাগিল, 'শেষ রাত্রেই উঠে পালাব।'

কানাইয়ের ঘুম ভাঙিতে ভাঙিতে ফরসা হইয়া গেল। তখন সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘোড়া আনিতে গিয়া দেখে—সর্বনাশ! বাঘ যে ঘরে বন্ধ আছে! বাহিরে আসিয়া তাহাকে খাইতে পারিবে না, সে কথা তখন তাহার মনেই হইল না। সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়া দরজার হুড়কা আঁটিয়া বসিয়া কাঁপিতে লাগিল।

এদিকে সকালবেলা সকলে সাতমার পালোয়ানের বাড়িতে খবর লইতে আসিয়াছে, বাঘ মারা হইল কি না। তাহারা আসিয়া দেখিল যে, বাঘ ঘরে বাঁধা রহিয়াছে। তখন সকলে ছুটিয়া গিয়া রাজাকে বলিল, 'রাজামশাই, দেখুন এসে, সাতমার পালোয়ান বাঘকে ধরে এনে ঘরে বেঁধে রেখেছে!'

রাজামহাশয় আশ্চর্য হইয়া সাতমার পালোয়ানের বাড়ি চলিলেন। সেখানে গিয়া দেখেন যে সত্যই বাঘ ঘরে বাঁধা। ততক্ষণে কানাই ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া আসিয়া রাজামহাশয়কে সেলাম করিয়া দাঁড়াইয়াছে। রাজা বলিলেন, 'সাতমার, ওটাকে মার নি কেন?'

কানাই বলিল, 'মহারাজ, আমি এক ঘায় সাতটাকে মারি, ও যে শুধু একটা!'

এখন হইতে সাতমার পালোয়ানের নাম দেশ-বিদেশে রাষ্ট্র হইয়া গেল। রাজামহাশয় যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া তাহার মাইনে পাঁচশত টাকা করিয়া দিলেন। কানাইয়ের দিন খুব সুখেই কাটিতে লাগিল।

কিন্তু সুখের দিন কি চিরকাল থাকে? দেখিতে দেখিতে কানাইয়ের আর-এক নূতন বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল।

এবারে বাঘ নয়, আর-একটা রাজা। সে অনেক হাজার সৈন্য লইয়া এই রাজার দেশ লুটিতে আসিয়াছে। এ রাজাটা নাকি বড়ই ভয়ানক লোক, তাহার সঙ্গে কিছুতেই আঁটা যায় না।

রাজামহাশয় বলিলেন, 'সাতমার, এখন উপায়? তুমি না বাঁচালে আমার আর রক্ষে নেই। তোমাকে আমার অর্ধেক রাজ্য দেব, যদি এবার বাঁচিয়ে দিতে পার।'

কানাই বলিল, 'রাজামশাই, কোনো চিন্তা করবেন না, এই আমি যাচ্ছি! আমাকে একটা ভালো ঘোড়া দিন।'

রাজার হুকুমে সরকারি আস্তাবলের সকলের চাইতে ভালো যুদ্ধের ঘোড়াটি আনিয়া কানাইকে দেওয়া হইল।

কানাই আজ দুই থান মার্কিন দিয়া পাগড়ি বাঁধিল। পোশাকটাও দস্তুরমতন করিল। মনে মনে কিন্তু তাহার মতলব এই যে, যুদ্ধে যাইবার ভান করিয়া একবার ঘোড়ার পিঠে চড়িতে পারিলেই পলায়নের সুবিধা হয়।

কিন্তু হায়, সেটা যে যুদ্ধের ঘোড়া কানাই তাহা জানিত না। সে বেচারা যতই ঘোড়াটাকে অন্য দিকে লইয়া যাইতে চায়, ঘোড়া কিছুতেই রাজি হয় না। যুদ্ধের বাজনা শুনিয়া ঘোড়া যখন নাচিতে লাগিল, কানাইয়ের তখন পিঠে টিকিয়া থাকা ভার হইল। শেষে ঘোড়া তাহার কোনো কথা না শুনিয়া একেবারে যুদ্ধের জায়গায় গিয়া উপস্থিত। পথে কানাই লতাপাতা গাছপালা খড়ের গাদা যাহা কিছু পাইয়াছে, তাহাকেই আঁকড়িয়া ধরিয়া ঘোড়া থামাইতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই সে ঘোড়া থামিল না। সেই গাছপালা আর খড়ের গাদা সবসুদ্ধই সে কানাইকে লইয়া ছুটিল।

এদিকে সেই বিদেশি রাজার সৈন্যরা শুনিতে পাইয়াছে যে এদেশে একটা সাতমার পালোয়ান আছে, সে এক ঘায় সাতটাকে মারে—বাঘকে ধরিয়া আনিয়া ঘরে বাঁধিয়া রাখে! এ কথা শুনিয়াই তাহারা বলাবলি করিতেছে, 'ভাই, ওটা আসিলে আর যুদ্ধ-টুদ্ধ করা হইবে না। বাপরে, এক ঘায় সাতটা মারিবে।'

এমন সময় সাতমারের ঘোড়া সেই দুই থান মার্কিনের পাগড়ি আর সেইসব গাছপালা আর খড়ের গাদা সুদ্ধ সাতমারকে লইয়া আসিয়া দেখা দিল! দূর হইতে বোধ হইতে লাগিল, যেন একটা পাহাড়-পর্বত ছুটিয়া আসিতেছে। বিদেশি রাজার সৈন্যরা তাহা একবার দেখিয়া আর দুবার দেখিবার জন্য দাঁড়াইল না। একজন যেই চেঁচাইয়া বলিল, 'ওই রে আসছে। এবারে গাছ পাথর ছুড়ে মারবে।' অমনি মুহূর্তের মধ্যে সেই হাজার হাজার সৈন্য চ্যাঁচাইতে চ্যাঁচাইতে কোথায় ছুটিয়া পলাইল তাহার ঠিকানা নাই।

কানাই দেখিল যে, বিদেশি সৈন্য সব পলাইয়াছে, খালি তাহাদের রাজাটা ছুটিতে পারে নাই বলিয়া ভ্যাবাচ্যাকা লাগিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কানাই মনে মনে ভাবিল, 'এ তো মন্দ নয়! পালাতে চেয়েছিলাম, মাঝখান থেকে কেমন করে যুদ্ধে জিতে গেলুম! এখন রাজাটাকে বেঁধে নিলেই হয়!'

আর কি! এখন তো সাতমার পালোয়ানের জয়জয়কার! অর্ধেক রাজ্য পাইয়া এখন সে পরম সুখে বাস করিতে লাগিল।

তিনটি বর

এক দেশে এক কামার ছিল, তার মতো অভাগা আর কোনো দেশে কখনো জন্মায়নি। তাকে এক জিনিস গড়তে দিলে তার জায়গায় আর-এক জিনিস গড়ে রাখত; একটা কিছু সারাতে দিলে তাকে ভেঙে আরো খোঁড়া করে দিত। আর লোককে ফাঁকি যে দিত, সে কী বলব! কাজেই কেউ তাকে কোনো কাজ করতে দিতে চাইত না, তার দুবেলা দুটি ভাতও জুটত না; লাভের মধ্যে সে তার গিন্নির তাড়া খেয়ে সারা হত।

একদিন সে দোকানে বসে গালে হাত দিয়ে ভাবছে। ভয়ানক শীত; গায়ে জড়াবার কিচ্ছু নেই। খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে; ঘরে খাবার নেই। এমন সময় কোত্থেকে এক এই লম্বা শাদা দাড়িওলা বুড়ো লাঠি ভর করে কাঁপতে কাঁপতে এসে তার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'জয় হোক বাবা, দুঃখী বুড়োকে কিছু খেতে দাও।'

কামার বলল, 'বাবা, খাবার যদি থাকত, তবে নিজেই দুটি খেয়ে বাঁচতুম। দুদিন পেটে কিছু পড়েনি, ছেলেপুলে নিয়ে উপোস করছি— তোমাকে কোত্থেকে দেব? তুমি না-হয় ঘরে এসে একটু গরম হয়ে যাও, আমি হাপর ঠেলে আগুনটা উসকিয়ে দিচ্ছি।'

বুড়ো তখন কাঁপতে কাঁপতে ঘরে এসে বলল, 'আহা, বাঁচালে বাবা; শীতে জমে গিয়েছিলুম। তুমি দেখছি তবে আমার চেয়েও দুঃখী। আমার নিজে খেতে পেলেই চলে, তোমার আবার স্ত্রী আর ছেলেপুলেও আছে।'

এই বলে বুড়ো আগুনের কাছে এসে বসল, কামার খুব করে হাপর ঠেলে আগুন উসকিয়ে তাকে গরম করে দিল। যাবার সময় বুড়ো তাকে বলল, তুমি আমাকে খেতে দিতে পারনি, তবু তোমার যতদূর সাধ্য তুমি করেছ। এখন তোমার যেমন ইচ্ছা, তিনটি বর চাও, আমি নিশ্চয় দেব।'

এ কথায় কামার অনেকক্ষণ বুড়োর মুখের দিকে চেয়ে মাথা চুলকোতে লাগল, কিন্তু কী বর চাইতে হবে, বুঝতে পারল না। বুড়ো বলল, 'শিগ্‌গির বল; আমার বড্ড তাড়াতাড়ি— ঢের কাজ আছে।'

তখন কামার থতমত খেয়ে বলল, 'আচ্ছা, তবে এই বর দিন যে, আমার এই হাতুড়িটি যে একবার হাতে করবে, সে আর আমার হুকুম ছাড়া সেটি রেখে দিতে পারবে না। আর যদি তা দিয়ে ঠুকতে আরম্ভ করে, তবে আমি থামতে না বললে আর থামতে পারবে না।'

বুড়ো বলল, 'আচ্ছা, তাই হবে। আর কী বর চাই?'

কামার বলল, 'আমার এই কেদারাখানিতে যে বসবে, সে আমার হুকুম ছাড়া তা থেকে উঠতে পারবে না।'

বুড়ো বলল, 'আচ্ছা, তা-ও হবে। আর কী?'

কামার বলল, 'আমার এই থলিটির ভিতরে আমি কোনো টাকা রাখলে আমি ছাড়া আর কেউ তাকে তা থেকে বার করতে পারবে না।'

সেই বুড়ো ছিলেন এক দেবতা। তিনি এই শেষ বরটিও সেই কামারকে দিয়ে ভয়ানক রেগে বললেন, 'অভাগা, তুই ইচ্ছা করলে এই তিন বরে পরিবারসুদ্ধ স্বর্গে চলে যেতে পারতিস, তার মধ্যে তোর এই দুর্মতি!'

এই বলে দেবতা চলে গেলেন, কামার আবার বসে বসে ভাবতে লাগল। হঠাৎ তার মনে হল যে, তাই তো, এই তিন বরের জোরে তো আমি বেশ দুপয়সা রোজগার করে নিতে পারি।

তখন সে দেশময় এই কথা রটিয়ে দিল যে, 'আমার দোকানে এলে আমি বিনি পয়সায় কাজ করে দেব।' দেশের যত কিপটে পয়সাওলা লোক, সে কথা শুনে তার দোকানে এসে উপস্থিত হতে লাগল। এক-একজন আসে, আর কামার তাকে দুহাতে লম্বা লম্বা সেলাম করে তার সেই কেদারাখানায় নিয়ে বসতে দেয়। বিনি পয়সায় কাজ করিয়ে চলে যাবার সময় আর সে বেচারা তা থেকে উঠতে পারে না, কামারও বেশ ভালোমতো তার কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় না করে তাকে উঠতে দেয় না। এমনি করে দিনকতক সে খুব টাকা পেতে লাগল। কাউকে এনে চেয়ারে বসায়, কারু হাতে তার হাতুড়িখানা তুলে দেয়, তারপর টাকা না দিলে আর তাকে ছাড়ে না।

যা হোক, ক্রমে সকলেই তার দুষ্টুমি টের পেয়ে ফেলল; তখন আর কেউ তার কাছে আসে না, কাজেই আবার তার দুর্দশার একশেষ হতে লাগল। এই সময় কামার একদিন একটা বনের ভিতর বেড়াতে গিয়ে একটি সাদাসিধে গোছের বুড়োকে দেখতে পেল। বুড়োকে দেখে সে আগে ভাবল, বুঝি কোনো উকিল হবে। কিন্তু তখনই আবার কোনো উকিলের সেই বনের ভিতর আসা তার ভারি অসম্ভব মনে হল। তারপর সে আবার ভালো করে চেয়ে দেখল যে সেই লোকটার পা দুখানিতে ঠিক ছাগলের পায়ের মতো খুর আছে। তখন আর তার বুঝতে বাকি রইল না যে, সেই বুড়ো আর কেউ নয়, স্বয়ং শয়তান। শয়তানের পা ঠিক ছাগলের মতো থাকে, এ কথা সেই কামার ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছিল!

আর কেউ হলে তখনই সেখান থেকে ছুটে পালাত। কিন্তু সেই কামার তেমন কিছু না করে জোড়হাতে শয়তানকে নমস্কার করে বলল, 'প্রণাম হই।'

শয়তান অমনি হাসতে হাসতে তার নাম ধরে বলল, 'কিহে, কেমন আছ?'

কামার বলল, 'আজ্ঞে, কেমন আর থাকব? দুবেলা দুটি ভাতও খেতে পাইনে।'

শয়তান বলল, 'বটে! তুমি এতই কষ্ট পাচ্ছ? তুমি কেন আমার চাকরি করো না, আমি তোমাকে ঢের টাকা দেব।'

ঢের টাকার নাম শুনে কামার তখনই শয়তানের কথায় রাজি হল, যদিও সে জানত যে তার কাজে একবার ঢুকলে আর কেউ ছেড়ে আসতে পারে না। শয়তান তখন তাকে তিন থলি মোহর দিয়ে বলল, 'এখন গিয়ে এই টাকা দিয়ে খুব আরামে খাও-দাও; সাত বছর পরে আমি তোমার কাছে আসব, তখন তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।' এই বলে শয়তান চলে গেল। কামারও হাসতে হাসতে টাকার থলি নিয়ে ঘরে ফিরল।

সেই তিন থলি মোহর নিয়ে কামার যারপরনাই খুশি হয়ে নাচতে নাচতে বাড়ি এল। ভাবল, এখন সাত বছর এই মোহর দিয়ে খুব ধুমধাম করে নেবে। সাত বছর পরে শয়তানের তাকে নিতে আসবার কথা, তখন তার সঙ্গে গেলেই হবে।

তারপর লোকে দেখল যে কামার কেমন করে রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেছে। এখন আর সে হাপরও ঠেলে না, লোহাও পেটে না ; এখন তার গাড়ি-ঘোড়া, চাকর-বাকরের অন্ত নেই। দিন যাচ্ছে আর তার বাবুগিরি ক্রমেই বেড়ে উঠছে। সে বাবুগিরিতে সাত বছর শেষ হবার ঢের আগেই শয়তানের দেওয়া সব টাকা ফুরিয়ে গেল, আর ঘরে একটি পয়সাও নেই, একমুঠো চালও নেই। তখন তাকে আবার যে কামার সেই কামারই হতে হল, নইলে খাবে কী?

তারপর একদিন সে তার দোকানে বসে একটা লোহা পিটাচ্ছে আর ভাবছে, কখন খদ্দের আসবে, এমন সময় একজন বুড়ো-হেন লোক ধীরে ধীরে এসে তার কাছে দাঁড়াল। কামার আগে ভাবল, 'এই রে খদ্দের!' তারপর চেয়ে দেখল, 'ও মা! এ যে শয়তান!'

শয়তান বলল, 'মনে আছে তো? সাত বছর শেষ হয়েছে, এখন আমার সঙ্গে চল।'

কামার বলল, 'তাই তো, আমি গেলে আমার ছেলেপুলেগুলো কী খাবে? তোমার তো কতই লোক আছে, আমাকে দয়া করে ছেড়ে দাও।'

শয়তান বলল, 'সে হবে না! আমাকে ফাঁকি দেওয়া বড় শক্ত কাজ; চল, এখনই চল।'

কামার বলল, 'তুমি ছাড়বেই না যখন, তখন তো চলতেই হবে, কিন্তু আমার হাতের এই কাজটি শেষ করে যেতে পারলে আমার ছেলেগুলোর পক্ষে বড় ভালো হত— এর দরুন কিছু পয়সা পাওয়া যাবে। তুমি দাদা আমার এই উপকারটুকু করো না— আমি সকলের কাছে বিদায় হয়ে নিই, ততক্ষণ তুমি বসে এই হাতুড়িটা দিয়ে এই লোহাখানিকে পেটো।'

শয়তান কাজে এমন দুষ্টু হলেও কথাবার্তায় ভারি ভদ্রলোক, সে কামারের কথা শুনে তখনই তার হাত থেকে হাতুড়িটি নিয়ে লোহাটাকে পেটাতে লাগল। সে জানত না যে সেটা সেই দেবতার বর দেওয়া সর্বনেশে হাতুড়ি, তা দিয়ে একবার পিটতে আরম্ভ করলে আর কামারের হুকুম ছাড়া থামবার উপায় নেই। কামার তার হাতে সেই হাতুড়ি দিয়েই অমনি যে ঘর থেকে বেরুল, আর একমাসের ভিতরে সেই মুখোই হল না।

একমাস পরে কামার দোকানে ফিরে এসে দেখল যে শয়তান তখনো ঠনাঠন ঠনাঠন করে বেদম হাতুড়ি পিটছে, আর তার দশা যে হয়েছে! খালি শয়তান বলে সে এতক্ষণ

বেঁচে আছে, আর কেউ হলে মরেই যেত। কামারকে দেখে সে অনেক মিনতি করে বলল, 'ভাই ঢের তো হয়েছে; আমাকে মেরে ফেলে তোমার লাভ কী? তার চেয়ে তোমাকে আরো তিন থলি মোহর দিচ্ছি, আরো সাত বছরের ছুটি দিচ্ছি, আমাকে ছেড়ে দাও।'

কামার ভাবল, মন্দ কী। আর তিন থলি মোহর দিয়ে সাত বছর সুখে কাটানো যাক। কাজেই সে শয়তানকে বলল, 'আচ্ছা, তবে তাই হোক।'

তখন শয়তান কামারকে আবার তিন থলি মোহর দিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেল, কামারও সেই টাকা দিয়ে আবার ধুমধাম জুড়ে দিল। তারপর সে টাকা শেষ হতেও আর বেশি দেরি হল না, তখন আর হাতুড়ি-পেটা ভিন্ন উপায় নেই। এমনি করে আবার সাত বছর কেটে গেল।

এবার শয়তান কামারকে নিতে এসে দেখে তার বাড়িতে ভারি গোলমাল। কী কথা নিয়ে কামার তার গিন্নির ওপর বিষম চটেছে, আর তাকে ধরে ভয়ানক মারছে। কামারের গিন্নিও যেমন-তেমন মেয়ে নয়, পাড়ার সকলে তার জ্বালায় অস্থির থাকে। কামারকে সে ঝাঁটা দিয়ে কম নাকাল করছে না, কিন্তু কামারের হাতে কিনা হাতুড়ি, কাজেই জিত হচ্ছে তারই। শয়তান এসে এ-সব দেখে কামারকে ভয়ানক দুই থাপ্পড় লাগিয়ে বলল, 'বেটা পাজি, স্ত্রীকে ধরে মারিস? চল্, আমার সঙ্গে চল্।'

শয়তান ভেবেছিল, এতে কামারের স্ত্রী খুব খুশি হয়ে তার সাহায্য করবে। কিন্তু কামারের স্ত্রী তার কিছু না করে, 'বটে রে হতভাগা, তোর এতবড় আস্পর্ধা! আমার স্বামীর গায়ে হাত তুলছিস!'— বলে সেই ঝাঁটা দিয়ে শয়তানের নাকেমুখে এমনি সপাংসপ মারতে লাগল যে বেচারার দমই ফেলা দায়। সে তাতে বেজায় থতমত খেয়ে একটা চেয়ারের উপর বসে পড়ল— সেই চেয়ার, যাতে একবার বসলে আর বিনা হুকুমে ওঠবার জো নেই।

কামার দেখল যে, শয়তান এবারে বেশ ভালোমতেই ধরা পড়েছে, হাজার টানাটানিতেও উঠতে পারছে না। তখন সে তার চিমটেখানি আগুনে তাতিয়ে নিয়ে তা দিয়ে আচ্ছা করে তার নাকটা টিপে ধরল। তারপর তারা স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে 'হেঁইয়ো' বলে সেই চিমটে ধরে টানতেই নাকটা রবারের মতো লম্বা হতে লাগল। এক হাত, দু হাত, চার হাত, আট হাত—নাক যতই লম্বা হচ্ছে, শয়তান বেটা ততই ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছে। নাকটা যখন কুড়ি হাত লম্বা হল তখন শয়তান আর থাকতে না পেরে নাকিসুরে বলল, 'দোহাই দাদা! আর টেনো না, মরে যাব।'

কামার বলল, 'আরো তিন থলি টাকা, আর সাত বছরের ছুটি— দেবে কিনা বল।' শয়তান ব্যস্ত হয়ে বলল, 'এক্ষুনি, এক্ষুনি, এই নাও।' বলতে বলতেই তিন থলি ঝকঝকে মোহর এসে কামারের কাছে হাজির হল; কামার সেগুলো সিন্দুকে তুলে শয়তানকে বলল, 'আচ্ছা, তবে যাও।' শয়তান ছাড়া পেয়েই সেখান থেকে এমনি ছুট দিল যে, ছুট যাকে বলে!

তখন কামার আর তার স্ত্রী মেঝেয় গড়াগড়ি দিয়ে যে হাসিটা হাসল! আর সাত বছরের জন্য তাদের কোনো ভাবনা রইল না। সাত বছর যখন শেষ হল, তখন

কামারের টাকাও ফুরিয়ে গেল, তাকে আবার তার ব্যবসা ধরতে হল, ততদিনে শয়তানও আবার তাকে নেবার জন্য এসে উপস্থিত হল।

সাত বছর পরে শয়তান আবার কামারকে নেবার জন্য এসে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু গত বারে সে নাকে যে চিমটি খেয়ে গিয়েছিল, তার কথা ভেবে আর সে সোজাসুজি কামারের সামনে এসে দাঁড়াতে ভরসা পাচ্ছে না, তাই এবারে সে ভারি এক ফন্দি এঁটে এসেছে।

শয়তান জানে যে, কেউ যদি তাকে নিজে থেকে আদর করে নিয়ে যায় তা হলে আর সে কিছুতেই তার হাত ছাড়াতে পারে না। তখন শয়তান করল কী, একটি ঝকঝকে মোহর হয়ে ঠিক কামারের দোকানের সামনে রাস্তায় গিয়ে পড়ে রইল। সে ভাবল যে কামার খেতে পায় না, মোহরটি দেখলে সে পরম আদরে তাকে এসে তুলে নিয়ে যাবে; তারপর আর সে শয়তানকে ফাঁকি দিয়ে যাবে কোথায়?

যে কথা সেই কাজ। কামার সেই মোহরটিকে দেখতে পাওয়ামাত্রই ছুটে গিয়ে সেটিকে তুলে এনে তার থলেয় পুরল। তখন থলের ভিতর থেকে শয়তান হেসে তাকে বলল, কি বাপু, এখন কোথায় যাবে? নিজে ধরে আমাকে ঘরে এনেছ, তার মজাটা এখনই দেখতে পাবে!'

কামার বলল, 'কি রে বেটা? তুই নাকি! তোর বুঝি আর মরবার জায়গা জোটেনি, তাই আমার থলের ভিতরে এসেছিস? দাঁড়া, তোকে দেখাচ্ছি!'

এ কথায় শয়তান এমনি রেগে গেল যে, পারলে সে তখনই কামারকে মেরে শেষ করে। কিন্তু থলের বাইরে এলে তবে তো শেষ করবে! সে যে সেই বিষম থলে— তার ভিতরে ঢুকলে আর বেরোবার হুকুম নেই! শয়তান বেচারার খালি ছটফটিই সার হল, সে আর থলের ভিতর থেকে বেরুতে পারল না। ততক্ষণে কামার সেই থলেটি তার নেহাইয়ের উপর রেখে গিন্নিকে ডেকে দুজনে দুই প্রকাণ্ড হাতুড়ি নিয়ে, দমাদ্দম দমাদ্দম এমনি পিটুনি জুড়ল যে পিটুনি যাকে বলে! পিটুনি খেয়ে শয়তান খানিক খুব চেঁচাল। তারপর যখন আর চেঁচানি আসে না, তখন গোঁঙাতে গোঁঙাতে বলল, 'ছেড়ে দাও দাদা, তোমার পায়ে পড়ি। এবার তোমাকে বিশাল বিশাল ছয় থলে ভরা মোহর দেব, আর— আর কখনো তোমার কাছে আসব না।'

এ কথায় কামারের গিন্নি বলল, 'ওগো, সে হলে নেহাত মন্দ হবে না; দাও হতভাগাকে ছেড়ে!' তখন কামার বলল, 'কই তোর মোহরের থলে?' বলতে বলতেই এমনি বড় বড় মোহরের থলে এসে হাজির হল যে তারা দুজনে মিলেও তার একটাকে তুলতে পারে না। তখন কামার একগাল হেসে, তার থলের মুখ খুলে দিয়ে বলল, 'যা বেটা! ফের তোর পোড়ামুখ এখানে দেখাতে আসবি তো টের পাবি।' ততক্ষণে শয়তান থলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এমনি ব্যস্ত হয়ে ছুট দিল যে, কামারের সব-কথা শুনতেও পেল না।

সেই ছটা থলের ভিতর এতই মোহর ছিল যে, কামার হাজার ধুমধাম করেও তা শেষ করতে পারল না। চার থলে ভালো করে ফুরুতে-না-ফুরুতেই সে বুড়ো হয়ে শেষে

একদিন মরে গেল। মরে গিয়ে ভূত হয়ে সে ভাবল যে এখন তো হয় স্বর্গে না-হয় নরকে দুটোর একটায় যেতে হবে। আগে স্বর্গের দিকে গিয়েই দেখি-না, যদি কোনোমতে সেখানে ঢুকতে পারি।

স্বর্গের ফটকের সামনে গিয়ে তার সেই দেবতাটির সঙ্গে দেখা হল, যিনি তাকে সেই তিনটি বর দিয়েছিলেন। তাঁকে দেখে কামার ভারি খুশি হয়ে ভাবল, 'এই ঠাকুরটি না আমাকে সেই চমৎকার বরগুলো দিয়েছিলেন? ইনি অবশ্যি আমাকে ঢুকতেও দেবেন।'

কিন্তু দেবতা তাকে দেখেই যারপরনাই রেগে বললেন, 'এখানে এসেছিস্ কী করতে? পালা হতভাগা, শিগ্‌গির পালা!'

কাজেই তখন বেচারা আর কী করে? সে সেখান থেকে ফিরে নরকের দিকে চলল। সেখানকার ফটকের সামনে উপস্থিত হলে শয়তানের দারোয়ানেরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম?'

কামার তার নাম বলতেই পাঁচ-ছয়টা দারোয়ান ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে শয়তানকে বলল, 'মহারাজ! সেই কামার এসেছে!' তা শুনে শয়তান বিষম চমকে গিয়ে একটা লাফ যে দিল! তারপর পাগলের মতো ফটকের কাছে ছুটে এসে দারোয়ানদের বলল, 'শিগগির দরজা বন্ধ কর! আঁট্ হুড়কো! লাগা তালা! খবরদার! ও বেটাকে ঢুকতে দিবি না! ও এলে আর কি আমাদের রক্ষা থাকবে!'

শয়তানের গলা শুনে কামার গরাদের ভিতর দিয়ে উঁকি মেরে হাসতে হাসতে বলল, 'কী দাদা! কী খবর!' সে কথা শেষ না হতেই শয়তান একলাফে এসে এমনি তার নাক মলে দিল যে কী বলব! কামার তখনই সেখান থেকে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে পালাল, কিন্তু তার আগেই তার নাকে আগুন ধরে গিয়েছিল। সে আগুন আজও নেভেনি। কামার তার জ্বালায় অস্থির হয়ে জলায় জলায় নাক ডুবিয়ে বেড়ায়। লোকে সেই আগুন দেখতে পেলে বলে, 'ওই আলেয়া।'

চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়

বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ

ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে

পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এই বইটি 'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'র

অন্তর্ভুক্ত।

বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

9841800357610